বেঁচে আছি
বাংলা ভাষায়

বেঁচে আছি
বাংলা ভাষায়

সম্পাদনায়
রোকেয়া বেগম রুকু

বেঁচে আছি বাংলা ভাষায়
সম্পাদনায়: রোকেয়া বেগম রুকু
প্রকাশকাল *৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়
শান্তিকুঞ্জ মোড়, বিসিক রোড, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব * সম্পাদক
প্রচ্ছদ ও বর্ণ বিন্যাস * ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই * দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য * ৩৫০/- (তিনশত) টাকা
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৬৬৩৬-৭-৬
ISBN : 978-984-96636-7-6
Beche Achi Bangla Bhashay
by Rokeya Begum Ruku
Published by Chayyanir. Shantikunja More, BSCIC Road,
Thanapara, Tangail, 1900.
Date of Publication:30 September 2022
Copy Right: Editor
Cover design & Book Setup: Chayyanir Computer
Price: TK. 350/- (Three Hundred Fifty Only)

উৎসর্গ

“যাঁরা আমাকে
সুন্দর পৃথিবী উপহার দিয়েছেন,
যাঁরা আমাকে
পারিবারিক পাঠশালায়
বাংলা ভাষা শিখিয়েছেন-
তাঁরা আমার পরম শ্রদ্ধেয়
মা-বাবা।”

সম্পাদকীয়

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, আমাদের প্রাণের ভাষা বাংলা। এই ভাষাতেই আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি। বাংলা ভাষায় কথা বলার অধিকার সহজে অর্জন হয়নি। এর জন্য করতে হয়েছে আন্দোলন, করতে হয়েছে সংগ্রাম। পৃথিবীর বুকে বাঙালিই একমাত্র জাতি যাঁরা ভাষার জন্য যুদ্ধ করেছে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতির জীবনে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

এই ভাষার জন্য রাজপথ রঞ্জিত হয়েছিলো। পুলিশের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়েছিলো সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার, শফিউর, অহিউল্লাহসহ নাম না জানা দামাল ছেলে। তাদের রক্তে ভেসে গিয়েছিলো সেদিনের পিচঢালা পথ। তবুও বাঙালি মাথা নোয়ায়নি। মায়ের ভাষা রক্ষায়, মাতৃভূমি রক্ষায় বায়ান্নর সিঁড়ি বেয়ে লিপ্ত হয় একাত্তরের শসস্ত্র সংগ্রামে। এ দুটি আন্দোলনেই নেতৃত্ব দেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যাঁর তর্জনীর ইশারায় স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো এ দেশের দামাল ছেলেরা।

বায়ান্নর ভাষা সৈনিক ও একাত্তরের বীর সৈনিকদের অবদানে আমরা পেয়েছি প্রিয় বর্ণমালা। যে বর্ণমালা না পেলে আজ আমার বই প্রকাশ পেত না। বাংলা সাহিত্যে পড়াশোনা করেছি, বাংলাকে বুকে ধারণ করে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত আছি। বাংলা ভাষার প্রতি প্রগাঢ় প্রেম থেকেই ‘বেঁচে আছি বাংলা ভাষায়’ গ্রন্থটি সম্পাদনা করা।

যাঁদের প্রবন্ধ আমার বইটিকে সমৃদ্ধ করেছে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। বাংলা ভাষার প্রেমিক যাঁরা, বাংলাকে লালন করে, বুকে ধারণ করে যাঁরা লেখালেখি করেন তাদের কিছু মূল্যবান লেখা আমার এই গ্রন্থটিতে সংযোজিত হয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই গ্রন্থটি পড়লে জানতে পারবে বাংলা ভাষার সৌন্দর্যের কথা, বাংলা ভাষার ঐতিহ্যের কথা। এই বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই ছায়ানীড়কে। বাংলা ভাষার মাধুর্যের কথা ছড়িয়ে যাক প্রতিটি প্রাণের কাছে। বিশ্বায়ন হোক বাংলা ভাষার। মুখে মুখে প্রতিধ্বনিত হোক একটিই বাক্য ‘বেঁচে আছি বাংলা ভাষায়।’

রোকেয়া বেগম রুকু

সূচি

বেঁচে আছি বাংলা ভাষায় ■ ১১
রোকেয়া বেগম রুকু
আমার ভাষা আমার দায়িত্ব ■ ১৫
ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল
বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় শেখ মুজিবের অবদান ■ ২০
মোনায়েম সরকার
উচ্চশিক্ষায় বাংলা ভাষার ব্যবহার ■ ২৪
ড. ইনামুল হক
ভাষা আন্দোলনের দিনগুলো ■ ২৮
মো. লুৎফর রহমান
বাংলা ভাষার সংগ্রাম এখনো অসমাপ্ত ■ ৩২
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
মহান ভাষা আন্দোলনে শহিদ ও সাথীদের উদ্দেশ্যে ■ ৪১
আব্দুল মতিন
বাংলাদেশে বাংলা ভাষা ■ ৫৭
হোসনে আরা শাহেদ
সর্বস্তরে বাংলা ভাষা: শুদ্ধ বানানে শুদ্ধ উচ্চারণে ■ ৮৭
অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান
বাংলা ভাষার শুদ্ধতা রক্ষা করতে হবে ■ ৯১
সালাহ্উদ্দিন নাগরী
বাংলা ভাষা বিশ্ব বাংলা পরিমণ্ডলের অন্যতম সমৃদ্ধশালী ভাষা ■ ৯৬
মনোজিৎ কুমার দাস
বাংলা ভাষা ব্যবহার ও বাস্তবতা ■ ১০২
ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ
আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলা ভাষা ■ ১০৬
মাজেদা বেগম মাজু
বাংলা ভাষার গৌরব গাঁথা ইতিহাস ■ ১১০
ইউছুব ওসমান
বাংলা ভাষার হালচাল ■ ১১৪
লুৎফর রহমান
যাঁদের রক্তে রঞ্জিত, প্রিয় বর্ণমালা ■ ১১৮
রোকেয়া বেগম রুকু

বেচেঁ আছি বাংলা ভাষায়

রোকেয়া বেগম রুকু

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদ। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে সপ্তম শতাব্দীর মীননাথ প্রথম বাঙালি কবি। চর্যাপদ রচয়িতা কাহ্নপা, ধর্ম্মপা, দারিকপা, ভুসুকুপা, লুইপা, শবরপা, শান্তিপা, সরহপা, ডোম্বীপা, কুক্কুরীপা, জয়নন্দীপা হাজার বছরের বাংলা ভাষার ঊষালগ্নের কবি।

খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী চর্যাপদ রচনার জন্য এই দুইশত বছর সিদ্ধাচার্যদের অবদান প্রশংসনীয়। যতিচিহ্ন হিসেবে শুধু দাঁড়ি (।) ব্যবহৃত হয়েছে চর্যাপদে। প্রবহমান নদীর মতই বাংলা ভাষা বয়ে চলেছে অবিরত। মধ্যযুগের কবি আবদুল হাকিম 'বঙ্গবাণী'

কবিতায় দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করলেন,

'যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি ॥
দেশি ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।
নিজ দেশ তেয়াগী কেন বিদেশ ন যায় ॥'

ভাষার প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা নিয়েই কবি আবদুল হাকিমের প্রত্যয়ী উচ্চারণ। উনিশ শতকের শুরুতে কোলকাতা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের তরুণ শিক্ষক ঈশ্বর

চন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষাকে উৎকর্ষের দিকে এগিয়ে দিলেন আরেক ধাপ। বাংলা ভাষায় যথাযথ যতিচিহ্ন প্রতিস্থাপনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বাংলা কবিতায় নতুনত্ব নিয়ে এলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কবিতার আঙ্গিকে তিনি নিয়ে এলেন অভিনবত্ব। মধুসূদনের পরেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার বাতিঘর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নোবেল বিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিলেন বাংলা ও বাঙালির কথা। তিনিই প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বানান সংস্কার কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে বাংলা বানান সংস্কারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে যখন ভারতের রাষ্ট্রভাষা কী হবে তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, তখন বাংলার শরীফ জাতের মুসলমানরা উর্দুর পক্ষে, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা হিন্দির পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। ঠিক সে সময়ে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী লিখিত প্রস্তাবের মাধ্যমে বৃটিশ সরকারকে বলেছিলেন,

"ভারতের রাষ্ট্রভাষা যাই হোক, বাংলার রাষ্ট্রভাষা করতে হবে বাংলাকে।"

নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বাংলা ভাষায় রচনা করলেন 'সুলতানার স্বপ্নসহ' কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ। জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ। বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান প্রশংসার দাবিদার। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই দেশের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে না বাংলা হবে, এই বিতর্ক শুরু হলে বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন।

২৬ জানুয়ারি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ঢাকার পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক জনসভায় উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। নূরুল আমিন সরকার আকস্মিকভাবে ১৪৪ ধারা জারি করলো মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে সর্বদলীয় কর্মপরিষদ কর্তৃক হরতাল প্রত্যাহার করা হলেও ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিবর্ষণে কয়েকজন ছাত্র নিহত হলেন। শেখ মুজিব কারাগার থেকে এই সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানান এবং মহিউদ্দিন আহম্মেদকে সঙ্গে নিয়ে অনশন অব্যাহত রাখেন। ভাষা আন্দোলনের ফসল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলো বাংলা একাডেমি।

ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির উৎকর্ষে বাংলা একাডেমি গবেষাণামূলক কাজ করছে। বাংলা ভাষার বানান ও উচ্চারণ উৎকর্ষে প্রমিত রীতি বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাঙালি জাতির সহস্র বছরের আন্দোলনের ফসল বাংলা ভাষা। স্বাধীনতার পর বাংলা ভাষাকে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে প্রচলনের বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলায় প্রথম ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়ে বাংলা ভাষাকে বিশ্ব দরবারে উপস্থাপন করেন।

১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ গঠন করা হয়। সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ জারি করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করেন। কাজী নজরুল আমাদের জাতীয় কবি। তাঁর কবিতা, গান, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ।

হাজারো সাহিত্যিকের অনন্য সৃষ্টি বাংলা ভাষাকে করেছে সমৃদ্ধ। ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মীর মশাররফ হোসেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, হজরত খান বাহাদুর আহছানউল্লাহ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ, বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মাহবুব উল আলম, আবুল মনসুর আহমেদ, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, আরজ আলী মাতুব্বর, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, আবুল ফজল, পল্লীকবি জসীম উদদীন, সৈয়দ, মুজতবা আলী, আব্দুল কাদির, বন্দে আলী মিয়া, সত্যেন সেন, মানিক বন্দোপাধ্যায়, শামসুননাহার মাহমুদ, আবু জাফর শামসুদ্দীন, সুফিয়া কামাল, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, আখতার ইমাম, আহসান হাবীব, শওকত ওসমান, ফররুখ আহমদ, অদ্বৈতমল্ল বর্মণ, সিকান্দার আবু জাফর, মুহম্মদ আব্দুল হাই, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, সত্যজিৎ রায়, ড. আহমদ শরীফ, আব্দুল গণি হাজারী, ড. নীলিমা ইব্রাহীম, মুফাখখারুল ইসলাম উয়াইসী, সৈয়দ আলী আহসান, সুকান্ত ভট্টাচার্য, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ড. আশরাফ সিদ্দিকী, মাহবুব-উল আলম চৌধুরী, শহীদুল্লাহ কায়সার, আব্দুস সাত্তার, বিচারপতি মুহম্মদ হাবিবুর রহমান, আনোয়ার পাশা, শামসুর রাহমান, জাহানারা ইমাম, এম আর আখতার মুকুল, ড. আব্দুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন, হাসান হাফিজুর রহমান, বদরুদ্দীন উমর, রোমেনা আফাজ, ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ, ড. রফিকুল ইসলাম, আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, রাবেয়া খাতুন, জহির রায়হান, সৈয়দ শামসুল হক, শওকত আলী, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, প্রফেসর ড. এনামুল হক, আল মাহমুদ, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, হাসান আজিজুল হক, রফিক আজাদ, আল মুজাহিদী, শামসুজ্জামান খান, প্রফেসর আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, জুবাইদা গুলশান আরা, বুলবুল খান মাহবুব, হোসনে আরা শাহেদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, আসাদ চৌধুরী, ড. করুণাময় গোস্বামী, ড. হুমায়ুন আজাদ, সেলিনা হোসেন, আবুল হাসান, ড. মাহবুব সাদিক, সাযযাদ কাদির, ড. হূমায়ুন আহমদ, ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, নির্মলেন্দু গুণ, হরিশংকর জলদাস, ইমদাদুল হক মিলন, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, আনিসুল হক প্রমুখ কথা সাহিত্যিক তাঁদের সৃষ্টিসম্ভার ছড়িয়ে দিচ্ছে সারা পৃথিবীতে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রচেষ্টায় একুশ ফেব্রুয়ারি আজ 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'। পৃথিবীর অনেক দেশেই এখন শহিদ মিনার নির্মিত হচ্ছে। সুদূর লন্ডনে আজ বাংলা বইমেলার আয়োজন করা হয়। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ বেজে ওঠে, UNESCO কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ আজ ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃত। বাংলা সাহিত্য, বাংলা সংস্কৃতি আজ পৃথিবী ব্যাপী বিস্তৃত।

ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল বাংলা ভাষাকে পৃথিবীর মধুর ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ায় আমরা গর্বিত, আমরা আনন্দিত। ভোরের দোয়েল যখন শিস দেয়, মাঝি যখন ভাটিয়ালী গান গায়, সেখানে বাংলার সুর বেজে ওঠে, রবীন্দ্র-নজরুল-জীবনানন্দ-সুকান্তের কবিতায় বাংলার সৌন্দর্য ফুটে ওঠে, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের আঁকা ছবিতে আব্দুল আলীম- আব্বাস উদ্দীনের গানে রাখালের বাঁশের বাঁশিতে ভেসে ওঠে বাংলার সুর; বাঙালির স্বপ্ন ও সংগ্রামে, প্রেম ও বিরহে বাংলা ধ্বনিত হয়। যতবার ঝড় আসে বাংলা ও বাঙালির ওপর ততবার ধ্বনিত হয় 'বেঁচে আছি বাংলা ভাষায়'।

আমার ভাষা আমার দায়িত্ব

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল

কিছুদিন আগে আমি কলকাতায় ভাষা-সংক্রান্ত একটি কনফারেন্সে গিয়েছিলাম। একটা সময় ছিল, যখন ভাষা নিয়ে গবেষণা করতেন ভাষাবিদেরা, প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করতেন প্রযুক্তিবিদেরা। তথ্য-প্রযুক্তির কারণে এখন অনেক প্রযুক্তিবিদ ভাষা নিয়ে গবেষণা করেন। আমাকে ডাকা হয়েছে সে কারণে। ভারতবর্ষে অনেক ভাষা, বাংলাভাষা সেগুলোর মাঝে একটি। আমাদের একটিমাত্র ভাষা, কাজেই বাংলা ভাষার গুরুত্ব আমাদের কাছে অনেক।

অনুমান করা হয়, পৃথিবীতে এখন প্রায় সাত হাজার ভাষা রয়েছে। অনেকেই হয়তো চিন্তাও করতে পারবে না যে, এই সাত হাজার ভাষা থেকে প্রতি দুই সপ্তাহে একটি করে ভাষা 'মৃত্যুবরণ' করছে। ভাষা কোনও প্রাণী নয়, তাই তার জন্য মৃত্যুবরণ

শব্দটা ব্যবহার করা যায় কিনা, সেটা নিয়ে তর্ক করা যেতে পারে, কিন্তু যখন একটি ভাষায় আর একজন মানুষও কথা বলে না, তখন ভাষাটির মৃত্যু হয়েছে বলা অযৌক্তিক কিছু নয়। অনুমান করা হয়, এই শতক শেষ হওয়ার আগেই পৃথিবীর অর্ধেক ভাষা মৃত্যুবরণ করবে। একটি ভাষা যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সঙ্গে বিশাল একটা ইতিহাসের মৃত্যু হয়, অনেক বড় একটা কালচারের মৃত্যু হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে, একটি জাতি যখন আরেকটি জাতিকে পদানত করতে চায়, তখন প্রথমেই তারা তাদের ভাষাটির গলা টিপে ধরে।

একসময় পৃথিবীর ভয়ংকর একটি দেশ ছিল সাউথ আফ্রিকা। সেই দেশের স্কুলের কৃষ্ণাঙ্গ বাচ্চাদের ওপর জোর করে আফ্রিকানা ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জুন প্রায় ২০ হাজার কৃষ্ণাঙ্গ স্কুলের বাচ্চা প্রতিবাদ করে রাস্তায় নেমে এসেছিল। শ্বেতাঙ্গ পুলিশ সেদিন গুলি করে একজন নয়, দুই জন নয় প্রায় সাতশত স্কুলের বাচ্চাকে মেরে ফেলেছিল। ভাষার জন্য পৃথিবীর ইতিহাসে এর চাইতে বেশি প্রাণ দেওয়ার উদাহরণ আছে বলে আমার জানা নেই।

আমাদের ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের কথা এখন শুধু আমরা নই, সারা পৃথিবী জানে। ২১ ফেব্রুয়ারি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। শুধু তাই নয়, আমাদের এই দেশটির জন্মের ইতিহাসটি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে একইসঙ্গে একই সূত্রে গাঁথা।

কিন্তু অনেকেই জানে না, বাংলা ভাষার জন্য আমাদের এই অঞ্চলে আরও একবার রক্ত ঝরেছিল। আসামের একটা বড় অংশ বাংলা ভাষায় কথা বলতো। তারপরও শুধু অহমিয়া ভাষাকে আসামের দাফতরিক ভাষা হিসেবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর সেখানকার বাঙালিরা তাদের ভাষার জন্য আন্দোলন শুরু করেছিল। সেই আন্দোলন থামানোর জন্য পুলিশ গুলি করে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মে এগারোজনকে হত্যা করে। তার মধ্যে একজন ছিল ১৬ বছরের কিশোরী কমলা, মাত্র একদিন আগে সে তার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা শেষ করেছিল। আসামের বরাক উপত্যকার সেই রক্ত শেষ পর্যন্ত বৃথা যায়নি, সেখানকার তিনটি জেলায় বাংলাও এখন দাফতরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে, আমরা যত গৌরবের সঙ্গে আমাদের ভাষা শহিদদের স্মরণ করি, আসামের ভাষা শহিদদের ততটুকু গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করা হয় বলে মনে হয়নি। আমরা একবার শিলচরে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম, তখন সেখানকার বাঙালি শিক্ষকেরা দুঃখ করে বলেছিলেন, তাদের ভাষা আন্দোলনকারীদের স্মরণে তৈরি করা শহিদ মিনারটিও তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে করার অনুমতি পাননি। সেটি তৈরি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার বাইরে। আমি মনে করি, প্রতি বছর ১৯ মে দিনটিতে বরাক উপত্যকার সেই ভাষা শহিদদের বাংলাদেশে গভীর ভালোবাসার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত।

ভাষা মৃত্যুবরণ করতে পারে, জানার পর আমার এক ধরনের কৌতূহল হয়েছিল, তাহলে কি ভাষা অসুস্থ হতে পারে? ভাষাবিজ্ঞানীরা এখনও অসুস্থ ভাষা হিসেবে

ভাষাগুলোকে চিহ্নিত করতে শুরু করেননি কিন্তু তার উল্টোটা আছে, 'প্রভাবশালী' ভাষা। কাউকে নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না, কথা বলার সংখ্যায় তৃতীয় হয়েও পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী ভাষা হচ্ছে ইংরেজি। পৃথিবীতে যে ভাষায় যতবেশি মানুষ কথা বলে, তাদের প্রভাবও সে রকম। তবে দুটো চোখে পড়ার মতো ব্যতিক্রম রয়েছে, একটি হচ্ছে ফরাসি ভাষা। কথা বলার সংখ্যায় তারা অনেক পেছনে, প্রায় আঠারো নম্বর কিন্তু প্রভাবের দিক দিয়ে তারা একেবারে দুই নম্বর। আবার বাংলাভাষা কথা বলার সংখ্যায় পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ হয়েও প্রভাবের দিকে অনেক পেছনে, একেবারে আঠারো নম্বর। বলাই বাহুল্য, তথ্যটি দেখে আমি যথেষ্ট বিচলিত হয়েছি। আমাদের বাংলা ভাষা এত পিছিয়ে আছে কেন? যত দিন যাবে, সারা পৃথিবীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমাদের ভাষাটি আরও পিছিয়ে যাবে? ভাষাটি কি আরও দুর্বল হয়ে যাবে?

এই মুহূর্তে বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষে বিশ কোটিরও বেশি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে। এটি বাংলাদেশের জাতীয় ভাষা, ভারতবর্ষ ও সিওরালিওনের দাফতরিক ভাষা। বাংলাদেশ ও ভারত এই দুটি দেশের জাতীয় সঙ্গীত বাংলাভাষায়। শুধু তাই নয়, বাংলা ভাষায় কথা বলে এমন প্রায় এককোটি মানুষ পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তারপরও বাংলাদেশ প্রতাপের দিক দিয়ে এত পিছিয়ে কেন?

তার কারণ বাঙালিরা কখনও অন্য দেশকে কলোনি করে জোর করে নিজ ভাষাকে অন্য ভাষার ওপর চাপিয়ে দেয়নি, কখনও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী দেশ ছিল না যে, অন্য ভাষার মানুষ আগ্রহ নিয়ে এই ভাষা শিখবে। শুধু তাই নয় তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে যখন ভাষাকে কম্পিউটারে ব্যবহার করার সময় এসেছে, তখন আমরা দেখছি বাংলা ভাষাকে তথ্য-প্রযুক্তি দিয়ে সমৃদ্ধ করার ব্যাপারে অনেক পিছিয়ে আছি! আমরা নিজেরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছি, বাংলা ভাষাকে তথ্য-প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে আমাদের সেরকম আগ্রহ নেই, অপেক্ষা করে আছি পৃথিবীর বড় বড় প্রতিষ্ঠান কোনও একসময়ে আমাদের সমাধান করে দেবে এবং তখন সেই সমাধান ব্যবহার করে আমরা কৃতার্থ হয়ে যাবো। কাজেই আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম, যখন বাংলাদেশ সরকার বাংলা ভাষার উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণার জন্য প্রায় একশত ষাট কোটি টাকার বরাদ্দ করেছে। যখন এই প্রজেক্টটি শেষ হবে, তখন একধাক্কায় আমাদের হাতে বাংলা ভাষায় গবেষণা করার জন্য অনেক মাল-মশলা চলে আসার কথা।

কলকাতার কনফারেন্সে গিয়ে সেখানকার অনেক গবেষক অধ্যাপকের সঙ্গে কথা হয়েছে। তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলে আমি একটি বিস্ময়কর বিষয় জানতে পেরেছি। আমাদের দেশে প্রাইমারি-সেকান্ডারিতে যারা পড়াশোনা করে, তাদের মাত্র পাঁচ শতাংশ ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করে। (৩০ শতাংশ মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে, সেখানে আলিয়া মাদ্রাসার অংশটুকু বাংলা মাধ্যম)। অর্থাৎ বাংলাদেশের লেখাপড়ার মূল ধারাটি হচ্ছে মাতৃভাষায়, যেরকমটি হওয়া উচিত। কলকাতার ছবিটি একেবারে ভিন্ন। যেহেতু তাদের প্রতিযোগিতাটি করতে হয় পুরো

ভারতবর্ষের সঙ্গে। তাই তারা আর নিজের মাতৃভাষায় পড়তে আগ্রহী নয়। সেখানে সবাই ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করে। শুধু যাদের কোনও গতি নেই, কোনও উপায় নেই, তারা বাংলা মাধ্যমে লেখাপড়া করে। যার অর্থ, এভাবে চলতে থাকলে মূলধারার বাঙালি বাংলাভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং বাংলা ভাষার পুরো দায়িত্বটি এসে পড়বে আমাদের হাতে।

যেহেতু ধীরে ধীরে পুরো পৃথিবীটা ছোট হয়ে আসছে, আমাদের বাংলাদেশের মানুষকেও এখন আগে থেকে অনেক বেশি আন্তর্জাতিক হতে হয়। আমাদের লেখাপড়ার মাঝে তার ব্যবস্থা করে রাখা আছে, ছাত্রছাত্রীরা বাংলার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বারো বছর ইংরেজি পড়ে। এই বারো বছর ইংরেজি পড়া হলে খুবই স্বাভাবিকভাবে একজন ছাত্র বা ছাত্রীর ইংরেজিতে যথেষ্ট দক্ষ হওয়ার কথা। কিন্তু যে কারণেই হোক আমাদের সব ছাত্র-ছাত্রী ইংরেজিতে যথেষ্ট দক্ষ হচ্ছে না। বাবা-মায়েরা দুর্ভাবনায় পড়ছেন এবং অনেকেই মনে করছেন ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া করানোই হয়তো তার সমাধান! কিন্তু আমরা সবাই জানি মাতৃভাষায় লেখাপড়া করার কোনও বিকল্প নেই। তাই আমরা যদি মাতৃভাষার দায়িত্বটি নিতে চাই, স্কুল কলেজে ঠিক করে ইংরেজি পড়াতে হবে। যদি স্কুল কলেজে লেখাপড়া করে ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট ইংরেজি শিখে যায়, তাহলে ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া করার জন্য ছুটে যাবে না।

কলকাতার ভাষা সংক্রান্ত কনফারেন্সে উড়িষ্যার একজন ভাষাবিদের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। তার কাছে আমি জানতে পারলাম, ভারতবর্ষে প্রত্যেকটি শিশুর তিনটি ভাষা শেখার কথা, একটি হিন্দি, একটি ইংরেজি, অন্যটি নিজেদের মাতৃভাষা। আমাকে তথ্যটি দিয়েই ভদ্রলোক হতাশভাবে মাথা নেড়ে জানালেন, তাদের দেশে পদ্ধতিটি মোটেও ঠিকভাবে কাজ করছে না। কেন কাজ করছে না, আমরা মোটামুটিভাবে তার কারণটি অনুমান করতে পারি-প্রবল প্রতাপশালী ইংরেজি ও হিন্দি ভাষার চাপে নিশ্চয়ই তাদের নিজেদের মাতৃভাষাটি কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। একজন শিক্ষার্থীকে একসঙ্গে তিনটি ভাষা শিখে বড় হওয়া নিশ্চয়ই খুব সহজ নয়। ভারতের তুলনায় আমরা অনেক সুবিধাজনক জায়গায় আছি। মাতৃভাষার পাশাপাশি আমাদের বেশির ভাগ ছেলেমেয়েদের মাত্র একটি ভাষা শিখতে হয়। সেটি হচ্ছে ইংরেজি। সেই ইংরেজিটুকু যদি ভালো করে শেখানো হয়, আমার ধারণা আমাদের মাতৃভাষা অনেক বেশি নিরাপদ থাকবে!

এখানে আরও একটি বিষয় বলা যায়। আমরা এখন সবাই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কিংবা নিউরাল নেটওয়ার্ক- এই ধরনের কথাগুলো শুনেছি। পৃথিবীতে গবেষণার জগতে এই বিষয়গুলো একেবারে নতুন একটি মাত্রা যোগ করেছে। এই বিষয়গুলো এখন যে কাজগুলো করতে পারে, সোজা ভাষায় সেটি শুধু যে অবিশ্বাস্য, তা নয় এটি রহস্যময়ও। গবেষণার এই নতুন মাত্রায় অবশ্যই আমাদের এখনও আনন্দ পাওয়ার বেশি কিছু নেই। কারণ এর জন্য প্রয়োজন উপাত্ত, লক্ষ লক্ষ উপাত্ত, কোটি কোটি উপাত্ত! কার আছে সেই উপাত্ত? আমাদের নেই। সেই উপাত্ত আছে ফেসবুকের হাতে, গুগলের হাতে, আমাজনের হাতে। এই উপাত্ত এখন

সোনার থেকেও দামি। সেই উপাত্ত ব্যবহার করে তথ্য-প্রযুক্তির এই মহাশক্তিশালী প্রতিষ্ঠান এখন শুধু আমাদের জীবন নয়, সারা পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আমাদের বলার কিছু নেই, কারণ তাদের সেবা গ্রহণ করে কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে আমরা তাদের হাতে আমাদের সব তথ্য, সব উপাত্ত উজাড় করে তুলে দিয়েছি!

কাজেই আগে হোক পরে হোক, আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। সেই নড়বড়ে পা নিয়ে আমাদের লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই, দেখতে দেখতে সেই পা শক্তিশালী হবে। অন্যের ঘাড়ে চড়ে বহুদূর দেখা যায়, কিন্তু তখন প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কায় থাকতে হয়, কখন তারা ঘাড় থেকে ছুড়ে কাদা মাটিতে ফেলে দেবে!

জেনেশুনে কেন আমরা সেই ঝুঁকি নেবো?

লেখক: প্রফেসর, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় শেখ মুজিবের অবদান

মোনায়েম সরকার

মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের কাছেই অত্যন্ত প্রিয়। মানুষ মাত্রই মাতৃভাষাকে ভালোবাসে। যে ভাষায় মনের সুখ-দুঃখ প্রকাশিত হয়, আবেগ-অনুরাগ ব্যক্ত হয়, দ্রোহে-সংগ্রামে মানুষ যে-ভাষার স্লোগান মুখে রাজপথের মিছিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে- সে-ভাষা মানুষ ভালো না বেসে পারে না। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা।

বাংলা আমাদের রাষ্ট্রভাষাও। পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে যাদের মাতৃভাষা, একইসঙ্গে রাষ্ট্রভাষা নয়, মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে যারা পায় নিঃসন্দেহে সে জাতি ভাগ্যবান জাতি, সেই বিচারে বাঙালি সৌভাগ্যবান। কেননা বাঙালির 'মাতৃভাষা' আর 'রাষ্ট্রভাষা দুটোই 'বাংলা'। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বাঙালিকে বুকের তাজা রক্ত দিতে হয়েছে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্য আগস্টে ভারত-পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করলে বাংলা ভূখণ্ড 'পূর্ব পাকিস্তান' নাম নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরের বছরেই

অর্থাৎ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকবর্গ। সেই ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করার জন্য পূর্ব বাংলার মানুষ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) বিক্ষোভে ফেটে পড়েন।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে যে নীলনকশা আঁকা হয় তার রক্তাক্ত সমাপ্তি ঘটে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি। এদিন বাংলা মায়ের বেশ কয়েকজন ভাষাসৈনিক শহিদ হন। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লড়াইয়ে যারা সেদিন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে যার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় তিনি হলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

শেখ মুজিবুর রহমান একজন সংগ্রামী ভাষাসৈনিক ছিলেন। বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভের আন্দোলনে শেখ মুজিবের অনন্য ভূমিকা ছিল। আমরা যদি বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থ দুটি পাঠ করি, তাহলে এ কথার সত্যতা দেখতে পাই। ভাষা-আন্দোলনে গ্রেফতার হয়েও জেলখানা থেকে কিভাবে শেখ মুজিব বাইরের নেতাকর্মীদের দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন সেটা ভাবলে অবাক হতে হয়।

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: জীবন ও রাজনীতি' গ্রন্থ লিখতে গিয়ে (বাংলা একাডেমি থেকে দুই খণ্ডে প্রকাশিত) আমি অনেক তথ্য পেয়েছি। যেসব তথ্য স্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দেয় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর কী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বাংলা ঠিকই রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি পায়। তবে সেই স্বীকৃতি আদায় করতে বিভিন্ন বয়সের ও শ্রেণি-পেশার বেশ কয়েকজন ভাষাপ্রেমী মানুষকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। যা বাঙালির জন্য অত্যন্ত বেদনার আবার অহংকারের বিষয়ও।

বাংলাকে অন্যতর রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিলেও বাংলাকে অবহেলা করার মনেবৃত্তি পাকিস্তানিরা চিরদিনই লালন করেছে। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত আইন পরিষদের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু সংসদের দৈনন্দিন কার্যসূচি বাংলা ভাষায় মুদ্রণ করার দাবির মধ্য দিয়েই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। সংসদের কার্যপ্রণালি বিধি অনুযায়ী দিনের কার্যসূচি তখন তিনটি ভাষা যথা- বাংলা, উর্দু ও ইংরেজিতে মুদ্রিত হওয়ার কথা থাকলেও পাকিস্তানিরা দিনের কর্মসূচি উর্দু আর ইংরেজিতে প্রকাশ করে। এটা নিয়ে বঙ্গবন্ধু উচ্চকণ্ঠ হন এবং তিনি সংসদে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে বোঝাতে সক্ষম হন যে, পাকিস্তানিরা ইচ্ছে করেই বাংলা ভাষার সঙ্গে বিমাতাসুলভ আচরণ করছে।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ মহান মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করার পূর্বে বঙ্গবন্ধু যত ভাষণ বিবৃতি প্রদান করেছেন- সেসব ভাষণ-বিবৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সুযোগ পেলেই বঙ্গবন্ধু বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির পক্ষে তার জোরালো অবস্থানের কথা ব্যক্ত করেছেন। এমনকি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণেও তিনি বাঙালির 'সাংস্কৃতিক' মুক্তির কথা স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছেন। বঙ্গবন্ধু জানতেন শুধু রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক মুক্তি হলেই একটি দেশ উন্নত

হতে পারে না, এ জন্য প্রয়োজন 'সাংস্কৃতিক মুক্তি'। আর সাংস্কৃতিক মুক্তি তখনই ত্বরান্বিত হয়, যখন 'ভাষা' সগৌরবে সর্বস্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলা ভাষাকে সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস হিসেবে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সুপ্রিম কোর্টে দেয়া ভাষণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের আমন্ত্রণে বঙ্গবন্ধু বিচারকদের উদ্দেশ্যে সেদিন একথাই বলতে চেয়েছেন যে, মাতৃভাষা বাংলাতেই বিচারকদের বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করা দরকার। হয়তো তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের কিছুটা সমস্যা হবে বাংলা ভাষায় বিচার কাজ পরিচালনা করা, কিন্তু নিয়মিত পরিচর্যা করলে বাংলা ভাষাতেই একদিন সুষ্ঠুভাবে বিচারিক কাজ সমাধা করা যাবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বঙ্গবন্ধু নিজে দাফতরিক নথিতে বাংলায় নোট লিখতেন এবং বাংলায় স্বাক্ষর করতেন।

ভাষার সমস্যা ও সে-সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ বঙ্গবন্ধুর অজানা ছিল না। তিনি জানতেন ব্যবহারের মাধ্যমেই ভাষা ক্রমে ক্রমে সবল হয়ে ওঠে। কোনো ভাষাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, ব্যবহারের ফলেই ধীরে ধীরে ভাষা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষাও সর্বস্তরে প্রচলিত করতে হলে আমাদের সেপথেই এগিয়ে যেতে হবে।

আজকের বাংলাদেশে এখনো সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন সম্ভব হয়ে ওঠেনি। যে পদক্ষেপ বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীনের পরেই নিয়েছিলেন সে পদক্ষেপ স্বাধীনতার ৪৯ বছরেও কেন বাস্তবায়ন করা গেল না এ ইতিহাস লিখতে গেলে অনেক কথাই বলতে হবে। এখানে সে বিষয়ে দৃষ্টিপাত না করে শুধু এটুকু বললেই বোধ হয় কাজ হবে যে, বঙ্গবন্ধু বাংলা ও বাঙালিকে যে উচ্চাসনে দেখতে চেয়েছিলেন তার অবর্তমানে কেউই সেভাবে বাংলা ভাষা নিয়ে আন্তরিক ভালোবাসা প্রদর্শন করেনি।

বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি একদিনেই বঙ্গবন্ধুর মননে গেঁথে যায়নি। হাজার বছরের বাঙালি ইতিহাস-ঐতিহ্যই তাকে এ কাজে প্রেরণা জুগিয়েছে। যে ভাষায় কবি গীতাঞ্জলি কাব্য লিখে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দেই নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, যে-ভাষার কবির অমর পঙক্তিমালা বঙ্গবন্ধু সুযোগ পেলেই আবৃত্তি করতেন, ভাষণ-বিবৃতিতে ব্যবহার করেছেন সে-ভাষার প্রতি বঙ্গবন্ধুর গভীর অনুরাগ থাকা অসম্ভব কিছু নয়।

বিশ্ববাসীর সামনে তিনবার বাংলা ভাষা মর্যাদার আসনে আসীন হয়। প্রথমবার ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার অর্জনের মাধ্যমে, দ্বিতীয়বার ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর বাংলায় ভাষণদানের মাধ্যমে, তৃতীয়বার ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদক্ষেপে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি প্রাপ্তির মাধ্যমে। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমির জাতীয় সাহিত্য সম্মেলনে উদ্বোধকের ভাষণে বঙ্গবন্ধু যে কথা বলেন তাতেও বাংলা ভাষার মহিমা প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলা ভাষার বিকাশে যারা বিশেষ অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে যাঁদের নাম বলতে হয় তারা হলেন উইলিয়াম কেরি, রাম রাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম এবং ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। উপরি-উক্তদের পরেও আরো অনেকে বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধনে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, ব্যক্তি উদ্যোগে ভাষার কখনোই পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন সম্ভব নয়, যদি সেখানে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা না থাকে। বঙ্গবন্ধুই বাংলা ভাষাকে প্রথম রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন।

বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন বাংলা ভাষা পৃথিবীর অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ ভাষা হোক, এ জন্য যা কিছু করণীয় সেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বঙ্গবন্ধু কখনোই পিছপা হননি। বঙ্গবন্ধু বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। বাংলার মর্যাদা বৃদ্ধিতে তিনি শুধু আদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, দেশের বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিকসহ সকল শ্রেণির মানুষের কাছেই তিনি আবেদন করেছেন, বাংলা ভাষার শ্রী বৃদ্ধিতে এগিয়ে আসতে। আজ বিজাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করতে হলে দ্রুত সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের পাশাপাশি মানুষের মানসিকতা পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়েছে।

বঙ্গবন্ধু পৃথিবীর অন্যতম সংগ্রামী রাজনৈতিক নেতা। তার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ শুধু স্বাধীনতাই অর্জন করেনি বাংলা ভাষাও সম্মানিত হয়েছিল। আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু বাংলা ভাষার প্রতি তিনি যে মমত্ব ও সম্মান প্রদর্শন করেছেন- তা আমাদের জন্য অনুসরণীয়। বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধিতে প্রত্যেকটি বাঙালি সাধ্যমতো আত্মনিয়োগ করুক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষের শুভ মুহূর্তে এটাই আমাদের অঙ্গীকার হোক।

লেখক: রাজনীতিবিদ, কলামিস্ট ও মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ

উচ্চশিক্ষায় বাংলা ভাষার ব্যবহার

ড. ইনামুল হক

স্বাধীনতাত্তোরকালে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি অত্যন্ত তীব্রভাবে সমুপস্থিত হয়েছিলো তা হলো আমাদের শিক্ষার মাধ্যম কি হবে? আবেগী তাড়নায় বায়ান্নের শহিদদের নাম উচ্চারণের সাথে সাথে স্বাধীনতার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে কেউ কেউ এমনও বলে ফেলেছিলো শিক্ষার দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত করবো বলেই তো মুক্তিযুদ্ধে নেমেছিলাম তাই সবার ব্যবহারযোগ্য ভাষা বাংলাই হবে আমাদের শিক্ষার মাধ্যম। এই সময় কেউ এর প্রতিবাদ করেছেন এই অর্থে যে, বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণে তাদের আপত্তি, বরং এই অর্থে যে, তা বাস্তবায়নের সমস্যাগুলো সম্পর্কে আমরা সচেতন নই। অবশ্য এটাও ঠিক যে, কেউ সরাসরি প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন, কেননা তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ইংরেজি ভাষা ছাড়া শিক্ষার মাধ্যম আর কোনো ভাষাই হতে পারে না। এসব বিতর্কের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা পরবর্তী বছরগুলো অতিক্রান্ত হয়েছে, রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা ও সৌহার্দ্য প্রেম আমাদেরকে এই উচ্চারণে সাহসী করেছিলো যে, বাংলাই একমাত্র শিক্ষার মাধ্যম হবে, আজ তা অন্তর্হিত। স্বাধীনতার সোনার কাঠির পরশে রাতারাতি আমরা খাঁটি

সোনা হয়ে উঠিনি বরং স্বাধীনতার আগুনে পুড়ে আমরা অঙ্গার হয়েছি। স্বপ্ন ভেঙেছে স্বপ্নের প্রাসাদবাড়ি ভেঙে জীর্ণ কুটিরের স্বপ্ন দেখি। স্বাধীনতার এই হচ্ছে ইতিহাস। এই ইতিহাস শিক্ষার মাধ্যমগত বিতর্কেও ছায়া ফেলেছে।

উল্লেখযোগ্য বিষয় একটি তা হলো বেশ ক'বছর আগেও যারা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ব্যবহারের প্রতিবন্ধকতার কথা বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছেন তারা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিবন্ধকতাকে তেমন একটা বিবেচ্য বিষয় মনে করেননি সম্ভাবনা ও সমস্যা উভয়ই দেখেছেন উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে। বাংলা ভাষার ব্যবহারই শুধু নয়, নতুন করে যেকোনো ভাষাই আজ উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে চালুর চেষ্টা করি না কেনো সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা বোধ করি একটি হবে।

সমস্যা যেমন আছে সম্ভাবনাও আছে, প্রতিবন্ধকতা ও প্রয়োজন উভয়ই একে অপরের অনুগামী হয়ে আছে এক্ষেত্রে। আর এই আলোচনা জটিল ও দুরূহ। আমরা চাই বা না চাই– এ সমস্যাগুলো সম্ভাবনাগুলোর মতোই অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী।

উচ্চশিক্ষায় বাংলা ভাষার ব্যবহার আলোচনার গোড়াতেই উচ্চ শিক্ষা বলতে কোন স্তর বুঝছি তা খোলামেলা করে নেয়া দরকার। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে বিবেচনা করলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উচ্চ মাধ্যমিকের উপরের স্তরকেই আমরা বলবো উচ্চশিক্ষা। আমাদের ক্রমবর্ধমান নিরক্ষর মানুষকে মনে রাখলে, বলতে দ্বিধা নেই, মাধ্যমিক শিক্ষাই রীতিমতো উচ্চশিক্ষা বলে মনে হওয়া উচিত। তথাপি সাধারণ অর্থে বলতে গেলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যে কেনো ছাত্রকে তার পেশাগত ভবিষ্যত বিবেচনায় কারিগরি বা সাধারণ দিক যেমন বেছে নিতে হয়; ঠিক তেমনি সাধারণ দিকের বিশেষীকরণ তাকে আরো ছোট্ট পরিসরে নিয়ে আসে। ফলে উচ্চশিক্ষার যে সাধারণ সূত্র পেশা নির্বাচনে সাহায্য ও বিশেষীকরণ, সেই দিকটি বিবেচনা করে উচ্চশিক্ষায় বাংলা ভাষার ব্যবহার বলতে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পরবর্তী স্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চাই। আর ব্যাপক অর্থে জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শনের ব্যাপকতর চর্চাকে বুঝি।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি আলোচনার প্রারম্ভিকে বলা দরকার তা হলো কেনো বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রসঙ্গটি তুলছি। বাংলা মাতৃভাষা হিসেবে আমাদের কাছে যেমন সহজ ও বোধগম্য তেমনি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে তা আলাদা তাৎপর্য বহন করে। শুধু কি তাই? একটি জাতির বিকাশকে নিশ্চিত করে তার আত্মনির্ভরতার চেতনা। বিশ্বের অপরাপর উন্নত দেশের প্রতি যদি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, তবে এটা বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, তাঁদের উন্নয়নের পেছনে ছিলো আত্মনির্ভরতার চেতনা এবং আপন সংস্কৃতির প্রতি মমত্ববোধ। জাতীয়তাবাদী চেতনা বলতে যা বুঝায়, তা হলো এই যে, আপনাকে তাঁর সহস্র ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে বিকশিত করে। জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা সেখানে আলাদা গুরুত্বের সাথে বিবেচ্য, কেননা তা না হলে জাতীয়তাবাদের চেতনাই বিনষ্ট হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাকে আরো বেশি গণমুখী চেতনায় লালন করতে হলে তা আরো বেশি মানুষের কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে। অধিক সংখ্যক মানুষকে এই

চর্চার সাথে সংশ্লিষ্ট করার জন্যেই মাধ্যমগত ত্রুটি অপসারণ জরুরী। মাধ্যম যেনো জ্ঞানচর্চার পথে প্রতিবন্ধকতা না হয়, বরং তা আরো উৎসাহী করে তোলে, আরো বেশি আকর্ষণীয় করে। বাংলা ভাষার ব্যবহার এই পরিপ্রেক্ষিতেই জরুরী। আরেকটি প্রধান কারণ হলো আজকের বিশ্বের প্রবণতা। বিভিন্ন জাতির ক্ষেত্রে যেমন চিন, জাপান, জার্মান ইত্যাদি যা খুব সহজে প্রত্যক্ষ করি, তা হলো আপন ভাষাকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস। উচ্চশিক্ষাকে যখন তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ থেকে বাইরে বিবেচনা করবে, তখন দেখবো তার সর্বজনীনতা। জ্ঞানের যে সর্বজনীন স্রোতধারা বিশ্বে প্রবহমান, আমরা তা থেকে বিচ্ছিন্ন নই, বরং আমরা সেই প্রবহমানতার অঙ্গ হিসেবে তাকে আরো বেশি এগিয়ে নিতে চাই। সেজন্যই আমাদের ভাবনা-চিন্তাকেও ঐ জ্ঞানস্রোতের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। তাঁর উপায় একদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার পরিবেশ তৈরি করা, অন্যদিকে তেমনি মাধ্যমগত দিক থেকে জনসাধারণের পক্ষে যেনো ঐ জ্ঞানক্ষেত্রে অংশ নেয়া কষ্টকর না হয়, তা নিশ্চিত করা। বাংলা ভাষার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা তাই এতো জরুরী। স্বাধীনতাত্তোরকালে আবেগী উচ্চারণে এই পরিপ্রেক্ষিতটি বিবেচনা হয়নি। তাই বাস্তবের কঠিন আঘাত- এ কর্পূরের মতো ঐ আবেগ যখন উবে গেছে, তখন অন্তর্হিত হয়েছে ঐ প্রয়োজন এ বোধটি না হলে আমরা বেশ খানিকটা পথ এগোতে পারতাম। তখন যারা বাংলা ভাষা ব্যবহারের সম্ভাব্যতা নিয়ে শংকিত হয়েছিলেন, তাদের অনেকেই বাঙালি আবেগের এই তারুণ্যের কথা বারংবার উল্লেখ করেছেন। কেননা বাঙালি আবেগ লালিত হয় না বরং পূর্বের মতো উধাও হয়ে যায়, খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে তাকে।

কিন্তু ঐ খোঁড়া যুক্তিতে বোধ কাজ করে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই কটি সম্পাদন না হওয়ার যৌক্তিকতা বুঝানো যাবে না। বরং তার মূল কারণগুলো খুঁজে দেখা দরকার। আলোচনার গোড়াতে আমি তাই অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের দাবি জানিয়েছিলাম। আমার আলোচনার ক্ষুদ্র পরিসরে তা অসম্ভব, তবে সাধারণ ও প্রধান প্রবণতাগুলোর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ব্যবহারে প্রধান প্রতিবন্ধকতার কথা জিজ্ঞেস করলে অনেককেই বলতে শুনি বাংলায় তো পড়াবো; কিন্তু বই কই? মেনে নিতে দ্বিধা নেই বই নেই। কিন্তু বই নেই কেনো? স্বাধীনতার পরপরই তো প্রশ্ন উঠেছিলো যে, বইয়ের সমস্যা তীব্র হয়ে উঠবে। আমাদের উচ্চশিক্ষায় বাংলা ভাষা ব্যবহারের নিশ্চিত করতে হলে বই দরকার হবে। তখন যারা কবুল করেছিলেন আপাতত ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে দেবেন। তারা বলেছিলেন এগুলোর নিজস্ব একটি ভাষা আছে অতএব দরকার পরিভাষার। যতদূর জানি, বাংলা একাডেমি দু-একটি বিষয় ব্যতীত উচ্চশিক্ষায় ব্যবহার্য প্রায় সব বিষয়ের জন্যই পরিভাষা তৈরি করে ছেপে বাজারে দিয়েছে। সবই যে ভালো হয়েছে, গ্রহণযোগ্য হয়েছে এমন নয়; তবে কাজটা শুরু করার মতো। কিন্তু তাতেও আমাদের অনীহা কাটেনি আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে সকাল গেছে দুপুর যায়, দুপুরের ভাত ঘুমানোর শেষে একবারে আড়মোড়া ভাঙার

তালে আছেন অনেকে; আর তাই যুক্তি দেখান ঐ পরিভাষা কাজের নয়। কোনো পরিভাষা শুধু নয়, ভাষার ব্যবহার ব্যতীত সঠিক অর্জন করতে পারে না। ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে গ্রহণ বর্জনের গতি প্রায় প্রাণ পায়। ঐ প্রয়াসটা না থাকলে কোনোদিন এই সমস্যা যাবে না।

কেননা আসলে এটা তো কোনো সমস্যা নয়। সমস্যাটি হচ্ছে মানসিকতার। আমাদের জ্ঞানচর্চার দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা যারা অন্তত প্রাতিষ্ঠানিকভাবে, তাদের শ্রেণি-চরিত্র তাদেরকে পদলেহন ছাড়া আর কিছুই শেখায়নি। বিদেশি প্রভুর তাবেদারীতে ঐ শ্রেণিতে জমা। আর তাই প্রভু কাছে নেই তবু তার লেজুড়বৃত্তিতে এদের অনীহা দেখি না। যারা বিশ্ব জুড়ে ভাষা সাম্রাজ্যবাদের তাবেদারীতে ব্যস্ত, এই শ্রেণির মানুষেরা সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের পথ খোলা রাখবার জন্যেই ইংরেজিভুক্ত। তাদের বিদেশযাত্রার পথ মসৃণ হয়। এদের আত্মস্বার্থের কাছে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রূপ নিয়েছে। ফলে এটা নয় ওটা, ওটা নয় সেটা বলে তারা সমস্যার জুজু দেখিয়ে সবকিছু পার করে দিয়েছেন। মানসিকতাটির পরিবর্তন প্রায় অসম্ভব, অন্তত সমাজের কর্তাব্যক্তি এই শ্রেণি-চরিত্র বজায় থাকলে তো নয়ই। তাই ভাষা প্রচলনেও সমাজবিপ্লব অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা ভীত হয়ে আছে, পাছে জ্ঞানচর্চা সবার জন্যে উন্মুক্ত হয়ে গেলে হুড়মুড় করে তাদের আসন ভেঙে নিচু মানুষেরা উপরে ওঠে আসেন, তাদের আধিপত্য ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তাই ভাষার প্রতিবন্ধকতা দিয়ে হলেও নীচ শ্রেণির মানুষদের কাছে জ্ঞানকে দুর্বোধ্য করে রাখতে হবে– কেননা জ্ঞানালোকের পথ দেখায় শোষণ মুক্তির পথও বৈকি।

আরেকটি প্রধান কারণের কথা উল্লেখ করবো, ভাষার অর্থনৈতিক তাৎপর্য। উচ্চশিক্ষায় যদি বা বাংলা চালু হয়, তবে কি ইংরেজির সমান গুরুত্ব পাবে? বাংলা ভাষায় পাস করা ছাত্র কি আজও দেশে ইংরেজির সমান মর্যাদা লাভ করে? করে না। কেননা অর্থনীতিতে প্রশাসনে ইংরেজিরই দোর্দণ্ড প্রতাপ বহাল রয়েছে। ঐ প্রভাব বহাল রেখে উচ্চশিক্ষায় বাংলা চালুর প্রস্তাবনা অর্থহীন। ভাষা প্রচলিত হয় তার অর্থনৈতিক তাৎপর্যের কারণেই ইতিহাস তার সাক্ষী। এই উপমহাদেশের মানুষ ফারসি শিখতো পরে ইংরেজি। কেননা অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা এককালে ফারসি দিয়েছে পরে ইংরেজি। আজকে ভারতে হিন্দি শিখতে হচ্ছে বাঙালি ভারতীয়কেও। আমরা যদি বাংলার ঐ অর্থনৈতিক মূল্য প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তবেই উচ্চশিক্ষায় বাংলা চালুর সম্ভাবনা দেখি। অন্যথায় তা হয়ে থাকবে কেবল আলোচনারই বিষয়। এসব আরো দীর্ঘ আলোচনার বিষয়। ক্ষুদ্র পরিসীমায় আমি তার উল্লেখ করলাম মাত্র। তবে বোধ করি মূল বিষয়গুলো ব্যক্ত হয়েছে। আর তারই আলোকে যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে সক্ষম হই, তবে একদিকে সমস্যা অন্যদিকে সম্ভাবনা উভয়ই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। কেননা উচ্চ শিক্ষায় বাংলা ভাষার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা আজ সর্বজনীন স্বীকৃত।

ভাষা আন্দোলনের দিনগুলো

মো. লুৎফর রহমান

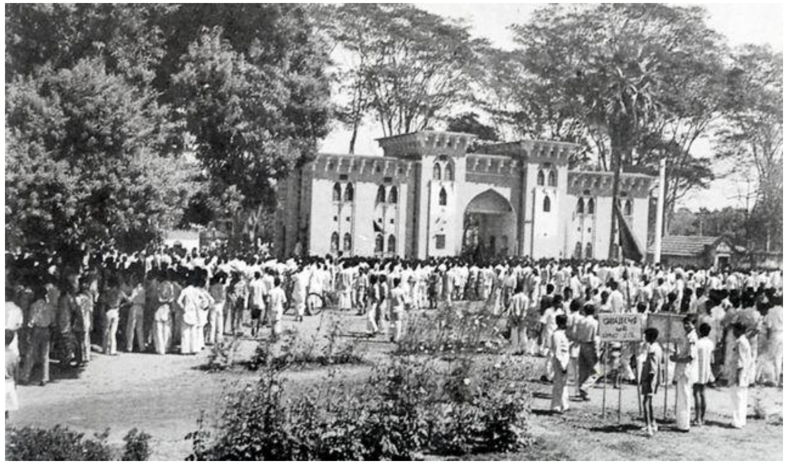

বাঙালি জাতির সবচেয়ে গৌরবের, সবচেয়ে অহংকারের ভাষা আন্দোলন। পৃথিবীতে একমাত্র বাঙালি জাতি মাতৃভাষাকে রক্ষা করেছে আন্দোলন করে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন একটি অনন্য ঐতিহাসিক ঘটনা। পাকিস্তানের জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৫৬ভাগ মানুষের মাতৃভাষা ছিলো বাংলা, অন্যদিকে উর্দু ভাষীর সংখ্যা ছিলো মাত্র ৬ ভাগ। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলা সত্ত্বেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বাংলাকে উপেক্ষা করতে থাকে। উপেক্ষিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষাও।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় তাসাদ্দুক হোসেনের সভাপতিত্বে পূর্ব পাকিস্তান যুব কর্মী সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের অফিস-আদালতে এবং শিক্ষার মাধ্যম

হিসেবে বাংলা প্রচলনের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এরপর তমদ্দুন মজলিশ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর প্রকাশ করে ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, বাংলা না উর্দু’। এ পুস্তিকায় অধ্যাপক আবুল কাশেম, কাজী মোতাহার হোসেন এবং আবুল মনসুর আহমদ বাংলা ভাষার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে উর্দুর সাথে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেয়ার দাবি জানান। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর তমদ্দুন মজলিশ ভাষা আন্দোলনকে সংগঠিত করতে গঠন করে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। এ সময় রাষ্ট্রভাষা বাংলার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে আয়োজিত বেশ কয়েকটি আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন কবি জসীমউদ্দিন, হাবীবুল্লাহ বাহার, কাজী মোতাহার হোসেন, অধ্যাপক আবুল কাসেম প্রমুখ।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ৬ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে এক ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে অনুষ্ঠিত একটি মিছিল সৈয়দ আফজাল প্রমুখ মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলা ভাষার সমর্থনে তাদের প্রতিশ্রুতি আদায় করে।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার উদ্দেশ্যে ঢাকায় নতুন করে গঠিত হয় ‘রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’। সংগ্রাম পরিষদ ভাষার প্রশ্নে যে দু’টি দাবি পেশ করে তা হচ্ছে: এক. বাংলা ভাষাই হবে পূর্ব বাংলার (পূর্ব পাকিস্তান) শিক্ষার বাহন ও অফিস আদালতের ভাষা এবং দুই. পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে দু’টি- বাংলা ও উর্দু।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ইংরেজির পাশাপাশি উর্দু ভাষাতে অধিবেশনের কার্যক্রম রেকর্ড শুরু হলে পূর্ব বাংলার গণপরিষদ সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এর প্রতিবাদ করেন এবং বাংলা ভাষাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবি জানান। কিন্তু গণপরিষদ এ দাবি প্রত্যাখ্যান করলে পূর্ব বাংলার ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী মহলে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং এর প্রতিবাদে ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন সংগঠনের এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং কামরুদ্দিন আহমেদকে সভাপতি নির্বাচিত করে গঠিত হয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। সংগ্রাম পরিষদ ১১ মার্চ থেকে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। ওই দিন ঢাকায় বহু ছাত্র আহত হয় এবং গ্রেফতার হন শেখ মুজিবুর রহমান, শামছুল হক ও অলি আহাদসহ অনেকে। এ ঘটনার প্রতিবাদে এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৩ মার্চ পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয় এবং এই ধর্মঘট ১৫ মার্চ পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। দেশের সব জেলাতেও এই ধর্মঘট পালিত হয়। এ অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন সংগ্রাম পরিষদের সাথে ১৫ মার্চ আলোচনায় বসে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তিতে আটক ছাত্রদলের মুক্তি, পুলিশী অত্যাচারের তদন্ত, বাংলাকে

রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব আইন পরিষদে উত্থাপন এবং ১৪৪ ধারাসহ সংবাদপত্রের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় আসেন এবং ২১ মার্চ ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে এক ভাষণ দেন। জনসভায় তিনি ঘোষণা করেন উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। ২৪ মার্চ কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে একই কথার পুনরাবৃত্তি করলে উপস্থিত ছাত্ররা ‘না’ ‘না’ বলে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ওইদিন রাষ্ট্রভাষা পরিষদের পক্ষ থেকে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে জিন্নাহকে একটি স্মারক লিপি প্রদান করা হয়।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে করাচিতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান সম্মেলনে ইসলামি আদর্শের ধুয়ো তুলে বাংলা ভাষার জন্য ‘আরবি হরফ’ প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়। আরবি হরফ প্রচলনের জন্য ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে নিয়োগের প্রস্তাব উঠলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এই প্রচেষ্টার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে বাংলা হরফ পরিবর্তন না করার দাবি জানিয়ে পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা, বোর্ড ও বর্ণমালা বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করে।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঢাকায় আসলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে তাঁকে দেয়া মানপত্রে বাংলা ভাষার দাবি পুনরায় উত্থাপন করা হয়। কিন্তু বিষয়টি এড়িয়ে যান তিনি। একই বছর অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনেও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ভাষার প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে মাসে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান গণপরিষদে ঘোষণা করেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। পূর্ব বাংলার জনগণ এ ঘোষণার প্রতিবাদ জানালে গণপরিষদে ভাষার প্রশ্নে আলোচনা স্থগিত হয়ে যায়।

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে আততায়ীর হাতে লিয়াকত আলী খান নিহত হলে খাজা নাজিমউদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি ঢাকার এক জনসভায় তিনি ঘোষণা করেন, ‘উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা’। খাজা নাজিমউদ্দিনের এ ঘোষণায় পূর্ব বাংলার গণমানসে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং এর প্রতিবাদে প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট ও হরতাল কর্মসূচি ডাকা হয়। সেদিনই আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। এ সংগ্রাম কমিটি রাষ্ট্রভাষার দাবি প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে এবং ৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্র ধর্মঘট ও ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। এদিকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী থাকা

অবস্থায় শেখ মুজিব ও ছাত্রনেতা মহিউদ্দিন আহমেদ রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও বন্দী মুক্তির দাবিতে আমরণ অনশন শুরু করেন।

নুরুল আমিন সরকার ছাত্র আন্দোলনের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৩টায় ১৪৪ ধারা জারি করে মিছিল ও জনসমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু ২১ ফেব্রুয়ারিতে ছাত্রছাত্রীরা সংগঠিতভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে মিছিল বের করে এবং 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিতে দিতে প্রাদেশিক পরিষদ মুখে অগ্রসর হয়। পুলিশ উপস্থিত ছাত্র-জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করলে সংঘর্ষ বাঁধে। এক পর্যায়ে পুলিশের গুলিতে জব্বার,রফিক, বরকত, সালামসহ অনেকে শহিদ হন, আহত হন বহু ছাত্র জনতা। এ হত্যাকাণ্ডের খবর দাবানলের মতো ঢাকা শহরে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর প্রতিবাদে ২২ ফেব্রুয়ারি একটি বিশাল শোভাযাত্রা বের হয়। এ শোভাযাত্রার ওপরেও পুলিশ গুলি চালায় এবং নিহত হন শফিউর রহমান। এদিনই মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসে ছাত্রদের আলোচনায় শহিদদের স্মৃতি রক্ষার্থে শহিদমিনার নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয় এবং সারারাত ধরে ছাত্ররা ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে ১২ফুট উঁচু শহিদমিনার নির্মাণ করে। ২৩ ফেব্রুয়ারি শহিদ শফিউর রহমানের পিতা আনুষ্ঠানিকভাবে শহিদ মিনার উদ্বোধন করেন। কিন্তু শহিদমিনারটি পুলিশ ২৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় গুড়িয়ে দেয়।

এ পরিস্থিতিতে নুরুল আমিন সরকার প্রাদেশিক পরিষদে সিদ্ধান্ত নেয় যে, বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গণ্য করার জন্য গণপরিষদে প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে। অবিরাম ছাত্র ও গণআন্দোলনের মুখে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃত দিতে বাধ্য হয়। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের শাসনতন্ত্রে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান করা হয়।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলন ছিল পূর্ব বাংলার জনগণের গণচেতনার প্রথম সংগঠিত বহির্প্রকাশ। এ আন্দোলনের চেতনাই পরবর্তী সময়ে সংঘটিত প্রতিটি আন্দোলনের প্রেরণা জোগায় এবং জনগণের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথকে সুগম করে স্বাধীনতা অর্জনে ভূমিকা রাখে। ভাষা আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়েই আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা।

বাংলা ভাষার সংগ্রাম এখনো অসমাপ্ত

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

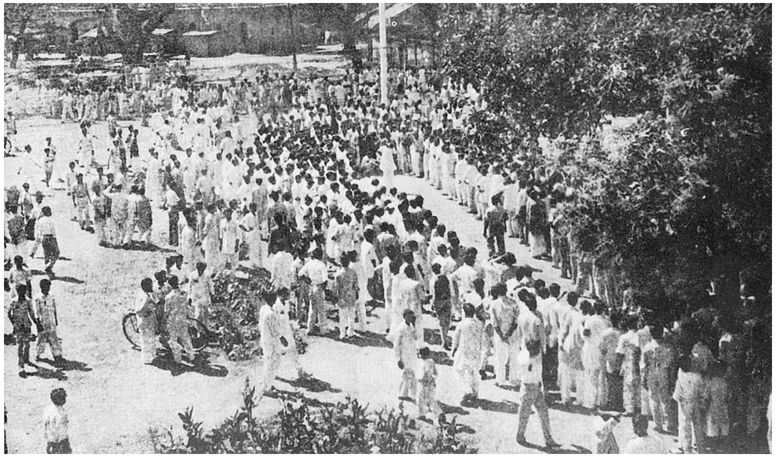

ব্রিটিশ ভারতে পাকিস্তান আন্দোলনে বঙ্গপ্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে কাজ করে, তেমনটি আর কোথাও ঘটেনি। বঙ্গ প্রদেশের মুসলমানের প্রচেষ্টার ফলেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। ২৩ মার্চ ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে নিখিল মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে আবুল কাশেম ফজলুল হক যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তা কালক্রমে পাকিস্তান প্রস্তাব বলে অভিহিত হয়। সেই প্রস্তাবে ভারতের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার দাবি করা হয়। ৯ এপ্রিল ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর অনুপ্রেরণায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এক পাকিস্তানের প্রস্তাব করেন। জিন্নাহ তাঁর ওকালতি বুদ্ধি খাটিয়ে বলেন, লাহোর প্রস্তাবে দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের কথাটা মুদ্রণপ্রমাদ ছিল।

উপমহাদেশের মুসলমান রাজনীতিতে বঙ্গ প্রদেশের মুসলমানদের বারবার কাজে লাগানো হয়েছে। ভারতে অন্যান্য মুসলমানদের জন্য বারবার স্বার্থ ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। প্রস্তাব পাস করার সময় লাগত বঙ্গদেশের লোক। কিন্তু নিখিল ভারত মুসলিম লীগে কোনো বাঙালিকে প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারি করা হয়নি। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতের অন্তবর্তীকালীন মন্ত্রিসভায় কোনো বাঙালি মুসলমান স্থান পায়নি। ক্যাবিনেট মিশন আলোচনার সময় কোনো বাঙালি মুসলমানকে গ্রহণ করা হয়নি। উত্তর ভারতীয় মুসলমান নেতাদের চাপে গণপরিষদের নির্বাচনে বাঙালি মুসলমানদের নিজেদের আসন থেকে ছয়টি আসন ছেড়ে দিতে হলো লিয়াকত আলী খান, আবদুল কাইয়ুম খান প্রমুখ অবাঙালি মুসলমানদের জন্য। গণপরিষদে বাঙালি মুসলমানদের সংখ্যা ৪৪ থেকে ৩৮-এ নামল এবং অবাঙালি মুসলমানদের সংখ্যা ২৫ থেকে ৩১-এ বৃদ্ধি পেলো। পাকিস্তানিরা ভেবেছিল, এই মহানুভব বাঙালি মুসলমানরা উর্দুকে সহজেই গ্রহণ করবে ধর্মের দোহাই ও দেশের সংহতির জিগির ঠিকমতো তোলা হলে। আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য যে পাকিস্তানের আন্দোলন, সেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যখন এ দেশের মানুষের সম্পর্কে অবমাননাকর ও অশোভন উক্তি করলেন এ দেশের গভর্নর মালিক ফিরোজ খানের মতো লোক, তখন মুসলিম সৌভ্রাতৃত্বের কথা বড়ো অসার ও নিরর্থক শোনাল।

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলা ব্যবহার করার জন্য সংসদ-বিধির এক সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, 'মাননীয় সদস্য প্রস্তাবটা পেশ না করলেই ভালো করতেন। মাননীয় সদস্যের বোঝা উচিত পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র এবং সেই রাষ্ট্র যে ১০ কোটি মুসলমানের জন্য তৈরি হয়েছে তাদের ভাষা উর্দু।'

গণপরিষদের কোনো বাঙালি মুসলমান সদস্য মাতৃভাষা বাংলা ভাষা খোদার সেরা দানের পক্ষে সমর্থন জানালেন না। সপ্তদশ শতকের কবি আব্দুল হাকিমের কথা কার মনে পড়েনি 'দেশি বিদ্যা যার মনে না জুরায়। নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশে ন যায়।' কেউ মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর মতো বললেন না, 'জাতীয়তা সৃষ্টির অনুরোধে বঙ্গদেশে উর্দু চালাইবার প্রয়োজন যতই অভিপ্রেত হউক না কেন, তার চেষ্টা আকাশে ঘর বাঁধিবার ন্যায় নিষ্ফল।' (১৩২২ বাংলা সাল)। কারও ইসমাঈল হোসেন শিরাজীর কথা মনে হলো না: 'বাংলার মাটি হইতে উর্দুকে নির্বাসিত করিতে না পারিলে বাঙলা ভাষা বাঙালি মুসলমান সমাজে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। (১৩২৬ বাংলা সাল)।

প্রেমহর বর্মণ, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ও শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করেন। শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাকিস্তানকে মুসলিম রাষ্ট্র অভিহিত করায় দুঃখ করে বলেন যে, 'তাহলে তো দেশের সংবিধান কেবল মুসলমানদের দ্বারাই রচিত হওয়া উচিত। তিনি বলেন, 'উর্দুতে তার আপত্তি নেই তবে লোকে তো উর্দু জানে না। তিনি জেলখানায় তমিজুদ্দিন খানের কাছে যা উর্দু শিখেছিলেন তা জেলের বাইরে

এসে ভুলে গেছেন।' সংসদের সদস্যরা হাসলেন। তমিজুদ্দিন খান প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতাকে মোলায়েম করার চেষ্টা করে বললেন, 'অনেক লোকে তো ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র বলে। আমার এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, পাকিস্তানের প্রতি অনুগত প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার ও সুবিধাদি ভোগ করার হক রয়েছে।

পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও বাঙালি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মানসজটিলতা থেকে মুক্তি পায়নি। সমসাময়িককালে ভারত বিভাগ সাময়িক বলে গান্ধী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, শরৎচন্দ্র বসু ও হিন্দু মহাসভার নেতারা যে বক্তব্য রাখেন, তাতে পূর্ববঙ্গের মুসলমান নেতারা বিচলিত ছিলেন। উপমহাদেশের ভাষায় রাজনীতিতে উর্দু-হিন্দুর যে দ্বন্দ্ব ছিল তারও একটা প্রভাব ছিল তাঁদের মনে।

স্বাধীনতার এক বছরের মধ্যেই পাকিস্তানের সংবিধান রচিত হলে এবং উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে তার মধ্যে এমন বিধান থাকলে গণপরিষদের পূর্ব বাংলার সদস্যরা সেই সংবিধানকে সমর্থন করতেন, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আর যদি উভয় পাকিস্তানের নেতারা বলতেন, ইংরেজিই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে তবে তার বিরুদ্ধে সেদিন কি কোনো আপত্তি শোনা যেতো?

'উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা', পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা ও দোর্দণ্ডপ্রতাপ গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ২১ মার্চ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে যে ঘোষণা দেন, তার বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা 'না' বলে আপত্তি জানাল। জিন্নাহ প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট উসকানিদাতাদের সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন এবং মুসলিম সমাজে সংহতির জন্য আবেদন জানালেন। তিনি ইন্তেকাল করেন ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে। লিয়াকত আলী খান ১৬ অক্টোবর ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে আততায়ীর হাতে নিহত হন। দুজনে কল্পনাও করতে পারেননি ১০ বছরের কম সময়ের মধ্যে উর্দুর সমান শরিক হিসেবে বাংলার দাবি সংবিধানে স্বীকৃতি লাভ করবে।

পাকিস্তানের সংবিধান ১৯৫৬-র ২১৪ অনুচ্ছেদে উর্দু ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও বলা হয়, পরবর্তী ২০ বছর ইংরেজির ব্যবহার চালু থাকবে এবং তারপরও পার্লামেন্ট আইন পাস করতে পারবে কী কী উদ্দেশ্যে ইংরেজি ব্যবহার করা যাবে। ১০ বছর পরে প্রেসিডেন্ট ইংরেজি পরিবর্তনের জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করেন। অবশ্য ২০ বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেও প্রাদেশিক সরকার প্রদেশে ইংরেজির পরিবর্তে যেকোনো একটি রাষ্ট্রভাষা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নিবৃত্ত হবে না।

৭ অক্টোবর ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে সংবিধান বাতিল হয়ে যাওয়ায় পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশে বাংলা প্রচলন করার আর কোনো সুযোগ রইলো না। ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দেশ এমনই কোন্দলে ব্যস্ত ছিল যে, বাংলা চালু করার তেমন গুরুত্ব দিয়ে কোনো দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তি চিন্তা করলেন না।

পাকিস্তান সংবিধান, ১৯৬২-এর ২১৫ অনুচ্ছেদে উর্দু ও বাংলাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও বলা হয় যে, যতদিন পর্যন্ত ইংরেজি সরানোর ব্যাপারে ব্যবস্থা না নেওয়া হচ্ছে তত দিন অফিসের কাজে ও অন্য উদ্দেশ্যে অপর কোনো ভাষা ব্যবহার, বিশেষ করে ইংরেজির ব্যবহার ব্যাহত হবে না এবং সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি সরানোর ব্যাপারটা পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্ট একটা কমিশন নিয়োগ করবেন।

১ জুলাই ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উন্নয়নের এবং উচ্চতর শিক্ষার স্তরে বাংলা প্রয়োগের প্রস্তুতিকল্পে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রদেশের বাংলা একাডেমি ও কেন্দ্রের উন্নয়ন বোর্ড অনুবাদকর্মে ও পরিভাষা নির্ণয়ে কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করে। রাষ্ট্রকর্মে বাংলার প্রচলনের তেমন কোনো সুযোগ ছিলো না। এ ব্যাপারে কারও তেমন সদিচ্ছাও ছিল বলে মনে হয় না।

বায়ান্নোর পর প্রায় তিন দশক ধরে দেশের সাংস্কৃতিক মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণে ভাষা আন্দোলনের উপার্জনই আমাদের একমাত্র পাথেয় হয়ে রইলো। বাংলাকে আরবি হরফের লেবাস পরানো, রবীন্দ্রবর্জন, নজরুল-প্রক্ষালন ইত্যাদি চোরাগোপ্তা হামলার বিরুদ্ধে সফলতার সঙ্গে এ দেশ রুখে দাঁড়াল। রুখে দাঁড়াল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেও। বুদ্ধিজীবীরা যখন দুই অর্থনীতি, ৬ দফা, বা পূর্ব বাংলা শ্মশান হলো কেন ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন তখন সকলের অগোচরে এক দফার কথা উঁকি দিতে শুরু করেছে দেশ-বিদেশে অনেক বাঙালির মনে।

১৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে দেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক ও জাতীয় উভয় পরিষদে নিরুঙ্কুশ জয় লাভ করলো।

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমির একুশের অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'আমি ঘোষণা করছি, আমাদের হাতে যেদিন ক্ষমতা আসবে সেদিন থেকেই দেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হবে। বাংলা ভাষার পণ্ডিতরা পরিভাষা তৈরি করবেন তারপরে বাংলা ভাষা চালু হবে, সে হবে না, পরিভাষাবিদেরা যত খুশি গবেষণা করুন আমরা ক্ষমতা হাতে নেওয়ার সঙ্গে বাংলা ভাষা চালু করে দেবো, সে বাংলা যদি ভুল হয়, তবে ভুলই চালু হবে, পরে তা সংশোধন করা হবে।'

এই বক্তব্যের মধ্যে যা- আছে তা-ই নিয়ে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার একটা ডাক আসে। এক পক্ষকাল পরে পাকিস্তানের জয় কামনা করেও শেখ মুজিব ঘোষণা দিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। সেই ডাকে সামান্যতম অস্পষ্টতা থাকলেও ২৬ মার্চের পাকিস্তানি হত্যাযজ্ঞের পর দৃশ্যপট সব পাল্টে গেলো। সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব পেছনে ফেলে বাংলাদেশ তার আপন সত্তা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে এক রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে লিপ্ত হলো। ১৫৩৮

খ্রিস্টাব্দে বাংলার স্বাধীন সুলতানি আমলের অবসানের পর বাংলার ইতিহাসে সে এক অনন্য ঘটনা।

১০ এপ্রিল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় (বর্তমান মুজিবনগরে) ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ এক গণপরিষদের মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অনেক কাজ বাংলায় সমাধান করলেও আইনের ক্ষেত্রে ও বিদেশি চিঠিপত্র আদান-প্রদানে ইংরেজি ব্যবহার অপব্যবহার অব্যাহত রাখলেন। শপথ অনুষ্ঠান, বেসামরিক ও সামরিক অনুষ্ঠান বাংলায় শুরু হলো। মুক্তিবাহিনীতে এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেনাবাহিনীতে বাংলা প্রচলনের কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়ন লাভ করে।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সম্পূর্ণ মুক্ত হয়। ২২ ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রবাসী সরকার দেশে প্রত্যাবর্তন করে। ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ঘোষণা করেন, বাংলা হবে দেশের সরকারি ভাষা। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাংলা প্রচলন সম্ভব হলো না। সংবিধানের পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধোত্তর জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করতে গিয়ে দেশে প্রেসিডেন্টের শতাধিক আদেশ ইংরেজিতে জারি করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলার অস্ত্রধারণের পর আমাদের দ্বিতীয় জাতীয় ইতিহাসে দ্বিতীয় যুগান্তকারী উল্লেখযোগ্য ঘটনা স্বায়ত্তশাসনের জন্য বাংলায় সংবিধান প্রণয়ন। এই সংবিধানের বৃহদংশ ইংরেজি থেকে তরজমা বলে মনে হয়। তবু, যে জনগণের অভিপ্রায়ে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়, তাদের ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সমীচীনতার সঙ্গে ১৫৩ অনুচ্ছেদে বিধান দেওয়া যে, সংবিধানের একটি নির্ভরযাগ্য পাঠ ও ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ থাকবে, তবে বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাবে। দেশের সুপ্রিম কোর্ট একাধিক রায়ে বাংলা পাঠকে কেবল সাংবিধানিক প্রাধান্য দেননি, তার প্রাঞ্জলতার সপক্ষে মন্তব্য করেছেন।

২০ আগস্ট ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২৯ নভেম্বর ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দেশে যে দুঃসময় বিরাজ করছিল সেই সময় যেসব ফরমানবলে সংবিধান পরিবর্তন করা হয় সেই পরিবর্তিত ও সংশোধিত বিধানাবলির ক্ষেত্রে ইংরেজি পাঠকে প্রাধান্য দেওয়া হবে বলে সংবিধানের চতুর্থ তফসিলে বিধান দেওয়া হয়। আসন্ন কালে মাতৃভাষায় আমরা থই পাই না, আমাদের বাংলা সরে না যে!

স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম একুশের উদযাপনে দনুকুলোদ্ভব দুরাত্মারা তাণ্ডবনৃত্য করে এক নিদারুণ চণ্ডাচরণের সূচনা করলো। সোনার বরণ সংবিধানে মানবাধিকার বিরোধী ছিটেফোঁটা যে চাঁদের কলঙ্ক ছিল তার সঙ্গে সংযোজিত হলো বিবর্তনমূলক আটক ও জরুরী অবস্থা ঘোষণার বিধান। আইনশৃঙ্খলার দ্রুত অবনতি, আইন ও সংবিধানের ক্লান্তিকর ও অগৌরবজনক পরিবর্তন সংশোধন, দুটো সামরিক শাসনের

রাহুগ্রাস, মানবাধিকারের লঙ্ঘন ও প্রতিকারের অপ্রতুলতায় অতিষ্ঠ দেশবাসীর কাছে সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের কথাটা তেমন বড়ো হয়ে দেখা দিলো না।

দেশের জনগণের মধ্যে অবশ্য বাংলা ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি পেলো। লোকে মাতৃভাষা ব্যবহারে আর তেমন বিব্রত বা লজ্জাবোধ করলো না। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছাত্ররা কখনো কখনো দুশ্চিন্তা করলো ইংরেজিতে প্রশ্নোত্তর লিখলে আবার তারা নম্বর কম পাবে না তো ! দুটো ভাষায় সব্যসাচীয় পারদর্শিতা লাভ করে, এমন লোকের সংখ্যা সমাজেই কম। বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী বাংলার মাধ্যমে অনেক স্বাচ্ছন্দ্যে লেখাপড়া শুরু করলো, শিক্ষার মান নিয়ে তেমন দুর্ভাবনা না করে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্কুল-কলেজের জন্য যেসব পাঠ্যপুস্তক ইতোমধ্যে রচিত হচ্ছিলো তাদের মানও উন্নতি লাভ করলো।

অপরদিকে দেশে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল, এ লেভেল-ও লেভেল-তোফেল পরীক্ষার ধুম পড়ে গেলো উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের মধ্যে। দেশে শিক্ষার শোচনীয় অবস্থা। জনসাধারণকে পেছনে রেখে, নিজে বাঁচলে বাপের নাম বলে জননেতা-জননেত্রী আমলা ভাষাসৈনিকদের অনেকের ছেলে- মেয়ে বিদেশের বিদ্যালয়ে আশ্রয় নিলো।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে যেখানে বারো আনা লোক নিরক্ষর ছিল তাদের মধ্যে অতি ধীরে ইতোমধ্যে শিক্ষার সঞ্চার শুরু হয়েছে। আজকে দুটি পরাশক্তির ভাষা ইংরেজি। ভূমণ্ডলায়নের কারণে দ্রুত সম্প্রসারিত আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাষা ইংরেজি। আন্তর্জাতিক চুক্তি, বীমা, পরিবহনের ভাষা ইংরেজি। ভূমণ্ডলের বিরাট অংশে আজ ইংরেজির সূর্য অস্ত যায় না, সেখানে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিও অনেক কাজের। আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণের ভাষা ইংরেজি। ইংরেজির সঙ্গে আমাদের ২০০ বছরের যে পরিচয়, আধুনিক নিমজ্জন পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা দান করলে দেশের ইংরেজির চাহিদা মোটামুটি মিটে যাবে এবং সেই আয়োজনে ১২ কোটি লোকের ওপর পরিভাষা চাপানোর প্রয়োজন নেই। সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত সেই লক্ষ্যের অভিমুখে দেশের জনগণ যেন তাদের স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে, তার জন্য আমাদের জনগণের ভাষায় ব্যবস্থা নিতে হবে।

সংবিধানের প্রথম ভাগে যেখানে দেশের নাম-ঠিকানা দেওয়া আছে সেখানে ৩ অনুচ্ছেদে পরিষ্কার করে বিধান দেওয়া হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। লক্ষণীয়, বাক্যটি বর্তমানকালবাচক। ভারত বা পাকিস্তানের মতো বহুভাষিক দেশে রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত সাংবিধানিক বিধানগুলো ভবিষ্যৎকালবাচক। বর্তমান ভারতে একটিমাত্র ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চালু করতে গেলে বেশ সমস্যার সৃষ্টি করবে। শ্রীলঙ্কায় সিংহলি ভাষার ব্যাপক প্রচলনে তামিল সংখ্যালঘুরা ঘোর আপত্তি জানায়।

সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদের ভর বা ব্যক্তি কী? দেশে প্রচলিত যেসব আইনবিধির বদৌলতে ইংরেজির ব্যবহার এখনো অক্ষুণ্ণ সেগুলো ৩ অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রভাবান্বিত, পরিবর্তিত বা পরোক্ষভাবে প্রতিস্থাপিত হয়েছে, না হয়নি? এসব প্রশ্নের চূড়ান্ত

সিদ্ধান্তের জন্য দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের কোনো নিবেদন করা হয়েছে কি না, আমার জানা নেই।

সংবিধানের ৩নং অনুচ্ছেদের বিধানকে পূর্ণরূপে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে এক সাংসদের ব্যক্তিগত বিলের প্রস্তাবের ওপর ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ২নং আইন পাস করা হয়। এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ একটা আইন সরকারের উদ্যোগে না হয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে পাস করা হলো কেন, আমি জানি না। দেশের জনগণ প্রস্তাবক না সরকার, কাকে স্মরণ করবে, আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করতে পারবেন।' এখন পর্যন্ত কোনো বিধি প্রণয়ন করা হয়নি।

হাশমতুল্লাহ বনাম আজমিনি বিবির 44DLR (1992)332 মামলায় হাইকোর্ট ডিভিশন ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ২নং আইনের নিম্নোক্ত ৩ ধারার ব্যাখ্যা দেন:

৩। প্রবর্তন ও কার্যকরী ব্যবস্থা। (১) এই আইন প্রবর্তনের পর বাংলাদেশের সর্বত্র তথা সরকারি অফিস, আদালত, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশের সাথে যোগাযোগ ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে নথি ও চিঠিপত্র, আইন আদালতের সওয়াল জবাব এবং অন্যান্য আইনানুগত কার্যাবলী অবশ্যই বাংলায় লিখিতে হইবে।

(২) ৩ (১) উপ-ধারায় উল্লিখিত কোনো কর্মস্থলে যদি কোনো ব্যক্তি বাংলা ভাষা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় আবেদন বা আপিল করেন তাহা হইলে উহা বেআইনী ও অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) যদি কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী এই আইন অমান্য করেন তাহা হইলে উক্ত কার্যের জন্য তিনি সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপিল বিধি অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

নিচের এক আদালত ইংরেজিতে লিখিত আপত্তি প্রত্যাখান করায় উক্ত মামলার সূত্রপাত। হাইকোর্ট ডিভিশন নিচের আদালতের আদেশ নাকচ করে দেন। কারণ, প্রচলিত আইনে ইংরেজি ব্যবহারের যেসব বিধান রয়েছে তা ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের আইনে পরিষ্কারভাবে বা পরোক্ষভাবে বাতিল করে দেয়নি এবং সরকারও দেওয়ানি কার্যধারা আইন অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক কোনো ঘোষণা দেননি এবং ৪নং ধারা অনুযায়ী সরকার কোনো বিধিও প্রণয়ন করেননি।

হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে কোনো আপিল করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। উক্ত রায়ের ফলকে নিষ্ক্রিয় বা পরিবর্তিত করার জন্য এ পর্যন্ত কোনো সংসদীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বলা বাহুল্য, সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্ট ডিভিশনের রায় সকল অধঃস্তন আদালতের জন্য অবশ্যপালনীয়।

রাষ্ট্রভাষার প্রচলনের জন্য আমাদের কলম ধরতে হবে। অস্ত্রের চেয়ে নাকি কলম বড়ো। শুধু কলম নয়, সর্বাধুনিক কম্পিউটার টেকনোলজি প্রয়োগের সুচিন্তিত

পদক্ষেপ নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। স্বাধীনতার পরপরই যদি এ ক্ষেত্রে আমরা কিছু বীজ বপন করতে পারতাম, তবে তার কিছু ফসল হয়তো আমরা ইতোমধ্যে ঘরে তুলতে পারতাম।

বাংলাদেশের আইন এ পর্যন্ত ইংরেজিতে এগারো খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। আল্লাহ জানেন দেশের সব আইন সংহিতারূপে সম্পূর্ণভাবে কবে প্রকাশিত হবে। এখন পর্যন্ত কোনো খণ্ডের বাংলা তরজমা হয়নি। জরুরি ভিত্তিতে যেসব আইন আজও ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলো অনুবাদ করার আশু পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন। এখন বাংলায় আইন হচ্ছে ইংরেজিতে লেখা পুরোনো আইনের সংশোধনের জন্য ইংরেজি ও বাংলা দুটো ভাষাই থাকছে। ইংরেজি ও বাংলা দুটো ভাষার হরফ, বাগধারা এবং গঠনভঙ্গি বড়োই বিভিন্ন। সুপ্রিমকোর্টের রায় ইংরেজিতে লেখা হলেও আজকাল প্রচুর বাংলায় লেখা আইন ও দলিলাদির অংশ অপরিহার্যরূপে উদ্ধৃত হচ্ছে। দাসত্বের বদৌলতে যে দ্বিভাষিক ভার আমাদের বইতে হচ্ছে তার থেকে আমাদের নিকট প্রতিবেশী নেপাল মুক্ত।

নেপালের প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাজা বীরেন্দ্র দেব যে সংসদ ভেঙে দিয়েছিলেন তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দেন, তার ইংরেজি অনুবাদ পড়ে আমার মনে হয়েছে, নেপালি ভাষায় রায়টা বেশ প্রাঞ্জলই হবে।

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাসে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত আপিল বিচারকগণের এক সম্মেলনে উপস্থাপিত এক প্রবন্ধে আমি বলেছিলাম, 'যদি ন্যায়বিচার সদগুণ হয় এবং জনগণের কল্যাণের জন্যই যদি এর কাজ হয় তবে তা জনগণের ভাষাতেই হওয়া উচিত।' প্রায় আট বছর পর ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে আমি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ করি। বারের অভিনন্দনের উত্তরে আমি সংবিধানে ২৩ অনুচ্ছেদের বরাত দিয়ে বলি, 'জাতীয় সংস্কৃতের সমৃদ্ধিতে অবদান রাখার ও অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ সর্বস্তরে জনগণের পক্ষে অসম্ভব হবে যদি আইন বোঝার জন্য, ব্যবহারের জন্য ও রাষ্ট্রভাষাকে আমরা তার সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত না করি। রাষ্ট্রকর্মে রাষ্ট্রভাষাকে ব্যবহার করার জন্য যেন কাউকে মাথা হেট করতে না হয়।'

আমার ঐ বক্তব্যের পরে এক ইংরেজি দৈনিকে কিছু স্বাস্থ্যকর বিতর্ক উত্থাপিত হয়। একজন বলেন, ইংরেজিতে রায় না লিখলে আমাদের রায় কেউ পড়বে না। অবসর গ্রহণের পর বার-প্রদত্ত এক বিদায়ী সভায় আমি বলি, আমাদের রায় পড়ার জন্য যেন সারা বিশ্ব জেগে বসে আছে। যেসব দেশের সঙ্গে আমাদের স্বার্থ জড়িত এবং বাণিজ্যের সম্পর্ক সেই সব দেশের বেশ কিছু লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখেছি, বাংলাদেশের ল' জার্নাল বা ল' রিপোর্ট নাই বললেই হয়। আমি জরিপ করে দেখেছিলাম, বাংলা ভাষার ব্যাপারে কোর্টে আমার বিচারক ভ্রাতৃবৃন্দ আমার মত সমর্থন করেন না, কিন্তু ভ্রাতৃপ্রতিম অনুকম্পায় তাঁরা আমার বিরোধিতা করেননি।'

আমি খোলাখুলি করে বলি, 'দেশের জনগণ যদি চান তাদের দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সব কাজ তাঁদর ভাষায় হবে, তবে তাঁদের প্রতিনিধিরা সংসদে যতদিন না আইন পাস করছেন ততদিন বিচারকবৃন্দ স্বেচ্ছায় বাংলায় হাতেখড়ি দিতে চাইবেন না।'

আগের আমলে প্রায় অনেক দেশে জনসাধারণের ভাষায় বিচারকার্য সমাধান হতো না। বহুদিন ধরে পশ্চিম ইউরোপের অনেক দেশে আদালতের ভাষা ছিল ল্যাটিন। ইংল্যান্ডে নরম্যাল-ফ্রেঞ্চ ভাষার পরিবর্তে রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড ১৩৬২ খ্রিস্টাব্দে আদালতে ইংরেজি চালু করলেন। আমাদের দেশে তুর্কিদের আসার আগে সংস্কৃতি ছিল ধর্মাধিকরণের ভাষা। তারপর আদালতে ফারসি চালু হয়। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ফারসির পরিবর্তে সেই যে ইংরেজি শুরু হয়েছে তা আজও আমাদের সর্বোচ্চ আদালতে বহাল আছে। আজ যখন আমরা জনগণের জন্য বিচার এবং জনগণের জন্য আইন ও আদালতের নাগালের কথা বলছি তখন প্রশাসনের সর্বস্তরের সঙ্গে সঙ্গে সর্বোচ্চ আদালতে বাংলা চালু করার জন্য সমস্ত প্রতিবন্ধকতা আমাদের দূর করতে হবে। দেশের আদালতে যে দ্বৈতশাসন চলছে নিচের আদালতে বাংলা ও উপরের আদালতে ইংরেজি- তার আশু অবসান হওয়া প্রয়োজন। যখন সংবিধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ দলিল বাংলায় প্রণীত হতে পারে, তখন বাংলায় আদালতের কাজ চালানো সম্ভব নয়– এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। এ ব্যাপারে যে অনীহা, অনিচ্ছা বা গড়িমসি দেখা যায়, তা দূর করার জন্য আইনগত বাধ্যবাধকতা আরোপ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

মিশনারিদের দৃষ্টান্ত, মাতৃভাষার ইতিহাস, শিক্ষাতত্ত্বে দিকনির্দেশনা এবং আধুনিক জনসংযোগ বিদ্যার অভিজ্ঞান আমাদের নতুন করে জানান দিচ্ছে সেই অতি পুরোনো কথাটার, মাতৃদুগ্ধের মতো মাতৃভাষার কেনো বিকল্প নেই, বিশেষ করে জনশিক্ষায় ও জনসংযোগ।

দেশের লোকের শিক্ষার দৈন্য ও দেশের লোকের বাংলা ভাষার দৈন্য মোচন না করতে পারলে দেশের উন্নয়ন বা দারিদ্র্য বিমোচনের কোনো আন্দোলনে আমরা তেমন আশান্বিত ফল লাভ করতে পারব না। যতদিন না আমরা সাক্ষরতা আশীর্বাদ প্রতিটি নাগরিকের ঘরে পৌঁছে দিতে পারছি, যতদিন বকলম ও ঢেরা সহির রেওয়াজ উঠে না যাচ্ছে, যতদিন নির্বাচনের প্রতীক হিসেবে হুক্কা, ধানের শীষ বা নৌকার প্রচলন বন্ধ না হচ্ছে এবং নিচের কাঠামো থেকে সমাজের উপরকাঠামো সকল কর্মকাণ্ডে, বিশেষ করে সর্বোচ্চ আদালতে বাংলার ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে, ততদিন বাংলা ভাষার সংগ্রাম আমি অসমাপ্ত বলে গণ্য করবো।

উনিশ শ' ছিয়ানব্বই ইংরেজি সালের এই অগৌরবের ফেব্রুয়ারিতে এসব কথা কে বা কারা শুনবে বা পড়বে?

সে সংশয় এখনো যায়নি। তাই ডাক দিয়ে যাই বাংলা ভাষার সংগ্রাম চলবেই চলবে।

মহান ভাষা আন্দোলনে শহিদ ও সাথীদের উদ্দেশ্যে

আব্দুল মতিন

ব্যাপক মুসলমান জনসমষ্টি সমর্থিত ধর্মের তথা দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে সদ্য প্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জাতিসত্তা সম্পর্কে অসচেতন একটি জাতির ভাষাকে সেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবীতে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে সূচিত ভাষা আন্দোলন এবং তার সর্বোচ্চ রূপ ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলন পৃথিবীর যে কোনো জাতির ভাষার অধিকারের দাবীতে আন্দোলনসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান সফল গৌরবোজ্জ্বল ও মহিমান্বিত এক আন্দোলন। এই আন্দোলন এতো বিরাট ও তাৎপর্যমণ্ডিত যে, একে সকলেই বিনা দ্বিধায় 'মহান আন্দোলন' বলে আখ্যায়িত করেন। সকল আন্দোলনের মতো এ আন্দোলনেরও একটি পটভূমি ও ইতিহাস আছে। পূর্বাপর এ আন্দোলনের সাথে আমি সম্পর্কিত এবং এ আন্দোলনকে তার সফল পরিণতিতে নিয়ে যাওয়ার নেতৃত্বকারীদানদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলাম। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে এই মহান আন্দোলনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে এই লেখাটির অবতারণা।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য– এ আন্দোলন জনগণের। সকল প্রকৃত এবং সকল আন্দোলনই জনগণের। কিন্তু আমাদের দেশের অন্যান্য আন্দোলনের মতো এই আন্দোলনকে, এই আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রথমাবধি (১৯৫০ থেকে) সংকীর্ণ কোনো উদ্দেশ্যে প্রণোদিত খাতে প্রবাহিত হতে না দিয়ে আন্দোলনের সকল ক্ষেত্রে সাধারণ ছাত্র ও জনগণের ভূমিকাকে প্রাধান্যে আনার ও প্রাধান্যে রাখার এক অনন্য রাজনৈতিক-সাংগঠনিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। এই কারণে ব্যাপক জনগণ, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র এই আন্দোলনের জন্য গর্ববোধ করে। এই আন্দোলন জনগণ বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের তৃপ্তি, আনন্দ, মর্যাদা, গর্ব, নেতৃত্ব ও বিজয়ের আন্দোলন।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রায় পর মুহূর্তেই ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসেই একটি জাতি, যে জাতি এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সংখ্যা ও সক্রিয়তায় মুখ্য ভূমিকায় ছিল সেই জাতি, তাদের ভাষাকে নতুন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে কেবল উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রচেষ্টাকে শাসকদের ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত বলে মনে করেছিল এবং ঐ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলো।

১৯৪০ খিস্টাব্দে মুসলিম লীগ লাহোর প্রস্তাব তথা অবিভক্ত ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রধান প্রদেশগুলোর সমন্বয়ে একটি রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। মুসলিম লীগ এর পর থেকে দ্রুত মুসলমান জনগণের আস্থা অর্জন করতে থাকে। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অবিভক্ত ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগ মুসলমানদের সবকটি আসনে জয়লাভ করে এবং মুসলিম অবিভক্ত ভারতবর্ষব্যাপী ঐদিনকে বিজয় দিবস হিসেবে পালন করে।

এরপর ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে অবিভক্ত ভারতবর্ষের প্রদেশগুলোর নির্বাচনেও মুসলিম লীগ প্রার্থীরা, বিশেষভাবে অবিভক্ত বাংলা প্রদেশে জয় লাভ করে। মুসলিম লীগ অবিভক্ত বাংলা প্রদেশের মুসলমানদের ভোটের শতকরা ৯৬.৭ ভাগ এবং ১১৯টি আসনের মধ্যে ১১৪টি আসন লাভ করে।

কিন্তু ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে অবিভক্ত ভারতবর্ষ যখন বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান হয়, তখন পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশ বিভক্ত আকারে এবং আসামের কেবল সিলেট জেলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। বাংলা ও আসাম প্রদেশ বিভক্ত হয়ে পূর্ব পাকিস্তান হওয়ায় মুসলিম লীগের উপর এ দেশের মুসলমান জনগণের, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের আস্থা অনেকটা সিথিল হয়ে যায় এবং মুসলিম লীগের উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে অতি ক্ষীণ হলেও সন্দেহ দেখা দেয়।

তবুও পাকিস্তান এ দেশের মুসলমান জনগণের জীবনে এক বিশেষ নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক রাজনৈতিক ঘটনা। এই প্রথম এখানকার মুসলমান জনসমষ্টি রাজনৈতিক

ও সামাজিকভাবে স্বাধীন হয়েছে বলে মনে করে। কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান হওয়ায় এ দেশের হিন্দু জনসমষ্টি এটাকে স্বাধীনতা বলে মনে করতে পারেনি। রাজনৈতিক স্বাধীনতা সম্পর্কে এই রকম মনোভাবের কারণে এ দেশের মুসলমান জনগণ পাকিস্তান অর্থে স্বাধীনতাই বুঝেছিল, যাতে ইংরেজদের শাসন থাকবে না এবং সেখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ী আমলা মহাজন ইত্যাদির সামাজিক অর্থনৈতিক আধিপত্যও থাকবে না। মুসলমান জনগণের ৯০ ভাগ কৃষক হওয়ায় তাদের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা ছিল পাকিস্তান হলে জমিদাররা থাকবে না। কারণ ব্রিটিশের বদৌলতে যারা জমিদার হয়েছিল তাদের ৯০-৯৫ ভাগ ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভূক্ত। পাকিস্তান হলে জমিদাররা বিশেষ করে হিন্দু জমিদাররা থাকবে না, এটাই এ দেশের মুসলমান জনগণের পাকিস্তান দাবী সমর্থনের প্রধানতম কারণ ছিল। সুতরাং শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান কলকাতাসহ বাংলার একটা অংশ এবং আসাম না থাকলেও এদেশের মুসলমান জনগণের মধ্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় বিশেষ আনন্দ ও উৎফুল্লতা এবং উদ্দীপনা ও আশার সঞ্চার হয় তাদের কাছে তখন অবাঙালি শাসক বা হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষ বিবেচ্য বিষয় ছিলো না। এ সময় তাদের জাতিবোধও প্রাধান্যে ছিল না। পাকিস্তানের উন্মেষ ও প্রতিষ্ঠার মুহূর্তে তারা প্রধানত মুসলমান এবং স্বাধীন নাগরিক এই বোধে আচ্ছন্ন এবং সুন্দর সুখি নিশ্চিত ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর। তখনও চিন্তা ভাবনায় তারা প্রধানত বাঙালি তথা বাঙালি জাতিসত্তা বোধ সম্পন্ন জনসমষ্টি নয়।

এই রকম বাস্তব ও চেতনার অবস্থায় পাকিস্তান অর্জনের মাত্র তিন মাস পর যখন তারা দেখল নতুন প্রচলিত টাকা, ডাক টিকিট, এনভেলাপ, মানিঅর্ডার ফর্ম ইত্যাদিতে বাংলা নেই, কেবল আছে ইংরেজির পাশে উর্দু। তখনই বুদ্ধিজীবী ও ছাত্ররা প্রতিবাদে গর্জে উঠলো এবং এ সবে উর্দুর পাশাপাশি বাংলার দাবী তুললো। বাংলাকে এইভাবে বাদ দেওয়ার হীন প্রবঞ্চনায় তারা নিজেদের ভাষা এবং তারই সঙ্গে নিজেদের জাতিসত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলো। শাসকের চরিত্র এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কেও তাদের মনে নানা প্রশ্ন দেখা দিলো। ইপ্সিত স্বাধীনতাকে অর্থপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনীয়তায় তারা তাদের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার গুরুত্ব উপলব্ধি করার মধ্য দিয়ে এক নতুন জগতে পৌঁছে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র, সরকারি কর্মচারী ও বুদ্ধিজীবীরা সভা, মিছিল, ঘেরাও ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠলো। তারা এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে অনেকটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মন্ত্রীদের বাড়িতে চড়াও হতে এবং সেক্রেটারিয়েট ও আইন সভায় প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের পাকড়াও করার কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে থাকলো এবং মফস্বলে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর ঘেরাও মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে চাপ সৃষ্টির পন্থা অবলম্বন করতে থাকলো। স্কুলে, কলেজে ছাত্ররা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবীতে ধর্মঘট, সভা এবং জনগণকে আন্দোলনে সামিল করার জন্য জনসভা মিছিল প্রভৃতির মাধ্যমে বৃহত্তর ধর্মঘট ইত্যাদি কর্মসূচিতে তৎপর হয়ে উঠতে থাকলো। এইসব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সকল স্তরের মানুষ দ্রুত মুসলমানত্বের

পাশাপাশি জাতিসত্তাবোধ সম্পন্ন হয়ে উঠতে থাকলো এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদার দাবী জনগণের প্রধান রাজনৈতিক কর্মসূচি হয়ে দাঁড়ালো। তিন মাস আগেও যারা পাকিস্তানের দাবীতে সোচ্চার ছিল, তারা কম কোনো কিছু শুনতে ও বুঝতে চাইতো না, তারাই তখন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবীতে কেবল সোচ্চার নয়, ঐ দাবী আদায়ের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে নতুন ভিত্তিতে সংগঠিত হতে শুরু করেছিল।

এই পটভূমিকায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবী অতি দ্রুত প্রবল আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করতে এবং নতুন চিন্তা চেতনার বিকাশ ও বিস্তার ঘটতে লাগলো। নতুন চিন্তা চেতনায় উদ্বুদ্ধ আন্দোলনে সামিল জনসমষ্টির তখন রাজনৈতিক প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ালো তাদের নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দাবী দাওয়াকে সংগ্রামে রূপ দিয়ে তাকে যৌক্তিক পরিণতিতে নিয়ে যেতে পারে এমন নেতৃত্বের।

কিন্তু কারা পূরণ করবে শূন্য অবস্থা ও জনগণের এই রাজনৈতিক প্রয়োজন? দ্বিজাতি তত্ত্বের ধারক বাহক শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মুসলিম লীগের দ্বারা তা হতে পারে না। কমিউনিস্ট পার্টি তখন পাকিস্তান ও জনগণ সম্পর্কিত নিজস্ব মূল্যায়ন দ্বারা এতই ভারাক্রান্ত, দ্বিধান্বিত ও বিভ্রান্ত এবং সংগঠনগতভাবে এতই নড়বড়ে ও বিশৃঙ্খল যে,তাদের দ্বারাও তখন বাস্তবতা ও জনগণ প্রত্যাশিত রাজনৈতিক প্রয়োজন পূরণ অসম্ভব। এই অবস্থায় থাকে কেবল ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা। কিন্তু তারা তখনও কেবল একটি সামাজিক শক্তি। রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে তারা নেতৃত্বের জন্য মোটেই কোনো শক্তি নয় এবং পাকিস্তানের ভাবাদর্শ থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত নয়। এই অবস্থায় যারা নিজেদের বাম ও প্রগতিশীল মনে করতেন, পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্বকারী এই রকম একটা গোষ্ঠী যারা মুসলিম লীগের দলীয় কোন্দলের বা হতাশার বা সিদ্ধান্তহীনতার পরিণতিতে ক্ষমতা বহির্ভূত, তাদের এক অংশ কমিউনিস্টদের সহযোগিতায় বা নিজস্ব উদ্যোগে এবং অপর অংশ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ গঠনের মাধ্যমে নেতৃত্বের শূন্যতা পূরণ করতে এগিয়ে এসে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবীতে আন্দোলনের আহ্বান জানালেও তারা নিজেদের মধ্যে ছিলেন চরমভাবে বিভক্ত এবং মতাদর্শগত দিক থেকে দক্ষিণ, তবে সেখানে অবস্থানের দিক থেকে বাম ও মধ্য। কামরুদ্দিন, তাজউদ্দিন, শওকত আলি, বাহাউদ্দিন, শামছুল হক, অলি আহাদ প্রমুখরা ছিলেন দক্ষিণের প্রথম অবস্থানে এবং শেখ মুজিবুর রহমান, আব্দুল হামিদ, ওদুদ, দবির উদ্দিন, নইম উদ্দিন, কাজী গোলাম মাহবুব, জালাল উদ্দিন, নুরুল ইসলাম প্রমুখ ছিলেন দক্ষিণের দ্বিতীয় অবস্থানে। এই দুই অবস্থান ছাড়াও দক্ষিণের আরো বিচিত্র অবস্থানের রাজনৈতিক ব্যক্তিরাও যেমন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, হাশিম উদ্দিন প্রমুখ নেতৃত্বে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নেতৃত্বে দুই একজন কমিউনিস্টও ছিলেন, যার মধ্যে মো. তোয়াহা অন্যতম। এর মধ্যে আমার মতো দুই একজন ছিল যারা পাকিস্তান আন্দোলনেও ছিল না, আবার কমিউনিস্টও না।

এরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উত্থিত বাংলা ভাষার দাবীতে বিক্ষিপ্ত আন্দোলনকে জোড়াতালি দিয়ে দাঁড় করিয়ে ১১ মার্চ (১৯৪৮) প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট ও আন্দোলনের ডাক

দেওয়ার পর যখন তা ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, সরকারি কর্মচারী ও জনগণের ব্যাপক সমর্থনে বিশাল আন্দোলনের রূপ নিলো এবং পাকিস্তান অর্জনের বিরাট সাফল্যের সন্তুষ্ট ও গর্বিত এই নেতৃত্ব হতবাক বিস্ময়ে কেবল কিংকর্তব্যবিমূঢ়ই হয়ে পড়লো না, পাকিস্তানের ভবিষ্যতের চিন্তায় বিভ্রান্ত ও শংকিত হয়ে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করলো, তার পরিণাম দাঁড়ালো আন্দোলনের উদ্দেশ্যে হীন দুর্ভাগ্যজনক পরিসমাপ্তি তথা পরাজয়ে।

পাকিস্তানের ভাবাদর্শের পরিবর্তে এবং বিপরীতে নতুন এক ভাবাদর্শে জাগ্রত জাতির বিজয়ের সম্ভাবনাময় এক মহান আন্দোলন প্রধান নেতৃত্বের ভীতি, বিভ্রান্তি ও পলায়নতায় নীরব ও নিস্তব্ধ হয়ে গেলো।

১৯৪৭-৪৮ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রথমদিকে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন আন্দোলনকে মোটামোটি পরিচালনা করতে সক্ষম হলেও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবী জাতিসত্তা বিষয়ক হওয়ায় ভাষা আন্দোলনকে তারা তাদেরই প্রচেষ্টা ও নেতৃত্বে গঠিত রাষ্ট্রের (পাকিস্তানের) চরিত্রের সাথে সমাঞ্জস্যপূর্ণ করতে পারছিল না। ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব যাদের নিয়ে গঠিত ছিল, তারা কখনও জাতিসত্তাগত কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পর্কিত তো ছিল না বরং পাকিস্তানেড়র আদর্শ গ্রহণ এবং পাকিস্তান অর্জনে নেতৃত্বমূলক ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে তারা জাতিসত্তার চেতনার বিকাশকে বুঝতেও পারছিল না এবং মেনেও নিতে পারছিল না। তাই জাতি দ্বারা সমর্থিত এবং জাতি দ্বারা সংঘটিত আন্দোলনকে শাসকদের সাথে আপোষ ও নিষ্ক্রিয়তার মাধ্যমে স্তব্ধ করে দেওয়া ছাড়া ঐ নেতৃত্বের গত্যন্তর ছিল না। একই ভাবাদর্শে লালিত ও গঠিত ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ব্যর্থ নেতৃত্বের সমগোত্রীয়রাই ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব পেতে চেয়েছিল। তারা ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারলে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভাষা আন্দোলনও যে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনে ভাগ্য বরণ করতো তা তাদের তথা সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদের অস্তিত্বের তিন সপ্তাহের (৩১ জানুয়ারি ১৯৫২-২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২) সাংগঠনিক নেতৃত্বকালীন কর্মকাণ্ডেই সাক্ষ্য বহন করে যা আমরা আলোচনা যথা সময়ে দেখতে পাবো। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের আন্দোলনের সমগোত্রীয়রা ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনে মূল নেতৃত্ব হতে পারেনি নিজেদের মেরুদণ্ডহীন এবং ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে গঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি, যুবলীগ ও সাধারণ ছাত্রদের সচেতন আপোষহীন বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণে। তবু ধর্মকে জাতি প্রতিপন্নের সহজ ও প্রতিক্রিয়াশীল কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে নেতৃত্ব আস্বাদনকারীরা ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের সম্ভাবনাময় ভাষা আন্দোলনে তাদেরই নেতৃত্বের কারণে ব্যর্থতা সত্ত্বেও সংশোধিত না হয়েই, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দেও নেতৃত্বের জন্য চেষ্টার কম করেনি।

জাতিসত্তার বহিঃপ্রকাশ নিজ ভাষা রাষ্ট্রভাষার দাবীতে ১৯৪৭-৪৮ খ্রিস্টাব্দে সূচিত একটি মহান আন্দোলনের পরাজয়মূলক পরিণতিতেও পাকিস্তানের এই অঞ্চলে যা ঘটে গেলো, তাতে একটি জনগোষ্ঠী তার জাতিসত্তা উপলব্ধি করার ফলেই

পাকিস্তানের ধর্মীয় ভাবাদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় চির ধরে গেলো এবং শাসকগোষ্ঠী জনগণ থেকে বহুল পরিমাণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো।

১৯৪৭-১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের ফলে রাষ্ট্রীয় তরীর মারাত্মক বিধ্বস্ততা এবং কাণ্ডারীদের বিহবলতার শোচনীয় অবস্থায় ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চের কয়েকদিন পর (১৯ মার্চ) কাণ্ডারী প্রধানের ঢাকায় তড়িঘড়ি আগমন সত্ত্বেও সে তরীর কোনো গতি হলো না। তিনি ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ভগ্নহৃদয়ে ফিরে গেলেন এবং পেছনে রেখে গেলেন মাত্র কয়েক মাস আগে পাকিস্তানের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত এক জনগোষ্ঠীর জায়গায়, জাতিসত্তার আদর্শে রূপান্তরিত এক জনগোষ্ঠীকে, যারা অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে এক মহান ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়াও, জাতিসত্তার ভিত্তিতে একটা রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠিত করেছিল দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত ও পরাজিত করে।

১৯৪৭-৪৮ খ্রিস্টাব্দের জনগণের বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন, নেতৃত্বের পূর্ববর্ণিত রাজনীতি, আচরণ ও ভূমিকার কারণে ব্যাহত হলেও এবং ঐ নেতৃত্ব কর্তৃক আন্দোলন পরিত্যক্ত হলেও জনগণ, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের মধ্যে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জাতিগত প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা এতো প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়ে কর্মসূচি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনগণ, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্ররা আন্দোলনে সামিল হতে শুরু করে। এই কমিটির কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে জনগণ এবং ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা ভাষা আন্দোলনের দিশা ও পথ খুঁজে পেয়েছিল। এই কারণে ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে (১১ মার্চ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠন ছিল এক অসাধারণ ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ ও ঘটনা।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ থেকে নতুনভাবে নতুন উদ্যোগে, নতুন নেতৃত্বে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে স্থগিত ভাষা আন্দোলনের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেই যাত্রাই পরিসমাপ্ত হয়েছিল দীর্ঘ দুই বছরের (১৯৫০-৫২) কষ্টসাধ্য প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ডের পরিশেষে ১৪৪ ধারা অমান্য করার মাধ্যমে ২১ ফেব্রুয়ারি পালন, গুলিবর্ষণ ও তার ফলে মৃত্যুর প্রতিবাদে ২২ ফেব্রুয়ারি গায়েবী জানাজা আহ্বান ও পালন এবং তার ফলশ্রুতিতে ২৩ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের মহান বিজয়।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ ছাত্র সমাবেশে যে প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভাষা আন্দোলনের মূল পরিচালক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছিল, সেই ঐতিহাসিক প্রস্তাবের প্রেরণা ও সূত্র আমি পেয়েছিলাম ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চের কয়েকদিন আগে পুরাতন জাদুঘরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত নিম্নবেতনভুক্ত সরকারি কর্মচারীদের ব্যারাকগুলোর পার্শ্বস্থ এক চায়ের দোকানে কয়েক জন সেক্রেটারিয়েট কর্মচারীর একান্ত নিজেদের মধ্যকার কথাবার্তার মধ্যে। সকালবেলা ঐ চায়ের দোকানের এক টেবিলে তারা আলাপ করছিলেন ভাষা আন্দোলন নিয়ে। তাদের

মধ্যে একজন বলেন, ছাত্ররা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার জন্য সংগ্রাম শুরু করলেই তারা ঐ দাবীকে সমর্থন করে আন্দোলনে সামিল হতে পারে। তার কথাকে সমর্থন করে আর একজন বলছিলেন, বাংলা রাষ্ট্রভাষা হওয়া না হওয়ার উপরই নির্ভর করছে বাঙালি জাতির ভবিষ্যৎ।

তাদের এই রকম ঘরোয়া কথাবার্তার মধ্য দিয়ে আমি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনের দিক নির্দেশ পেয়েছিলাম। তাদের কথাবার্তায় আমি ভালোভাবে উপলব্ধি করলাম যে, মানুষ কেবল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবেই চায় না, তারা তার জন্য আন্দোলনও করতে চায়। সে আন্দোলন কারা সূচনা করবে, কারা নেতৃত্ব দেবে সে সম্পর্কেও তাদের কথাবার্তায় ছিল সুস্পষ্ট আভাস।

এই সব কথাবার্তার ভিত্তিকেই আমি ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ১১ মার্চের বার্ষিকী পালন উপলক্ষে আহুত জনসভায় বলেছিলাম, গতানুগতিক বার্ষিকী উদযাপনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সাধারণ মানুষ ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে যা চিন্তা ভাবনা করে ও যা করতে বলে সেটা করাই হবে এই মুহূর্তের ভাষা আন্দোলনের জন্য সঠিক করণীয়। আরো বলেছিলাম, এই কাজটা ছাত্ররা করতে পারে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষাকামী ছাত্র সংগঠনগুলোকে নিয়ে একটি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠনের মাধ্যমে। এই সংগ্রাম কমিটি দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুরূপ সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলবে এবং ছাত্রদের সংগঠিত শক্তির মাধ্যমে আন্দোলনকে এমনভাবে এগিয়ে নেবে, যাতে জনগণ ধাপে ধাপে সামিল হতে পারে এবং এইভাবে ছাত্র ও জনগণের মিলিত শক্তিতে আন্দোলন এমন দুর্বার হয়ে উঠবে যার কাছে শাসকরা মাথা নত করতে বাধ্য হবে। জনগণ, বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ ছাত্ররা এটাই চায়, সুতরাং তাদের সে ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে এইভাবে সংগঠিত করলে যে শক্তির উদ্ভব ঘটবে, তা হবে অপ্রতিরোধ অজেয়।

আমাদের এই প্রস্তাবমূলক বক্তব্যে সমবেত ছাত্ররাও ভাষা আন্দোলনের বিরাট সম্ভাবনা দেখতে পেলেন। এইভাবে সাধারণ ছাত্রদের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, উত্থাপিত প্রস্তাব, সর্বসম্মতভাবে সমর্থনের ভিত্তিতে, সকল ছাত্র ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছিল।

এই সংগ্রাম কমিটি দুই মাস পরই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবীতে পতাকা দিবস পালন, অর্থ সংগ্রহ অভিযান, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের পক্ষ থেকে কমিটির নামে করাচী অধিবেশনকালে গণপরিষদে স্মারক লিপি এবং তার প্রতিলিপি পাকিস্তানের সকল পত্রিকায় প্রেরণ, অসংখ্য প্রচারপত্র বিশ্ববিদ্যালয় ছুটির সময় ছাত্রদের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিলি, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সকল প্রতিষ্ঠানে ১১ মার্চ পালন , ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের পল্টন ময়দানের জনসভায়, বাংলাসহ উর্দুর পরিবর্তে, কেবল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার উক্তির প্রতিবাদে প্রথমে ৩০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পরে ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

ধর্মঘট পালন ও মিছিল, সভা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে, পরিকল্পিত উপায়ে, অতি আবশ্যকীয় প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন ও নির্ধারক কর্মসূচির পূর্বশর্ত সৃষ্টির মাধমে ভাষা আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যায়।

২১ ফেব্রুয়ারির মাত্র সপ্তাহ দুই প্রাক্কালে ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটি কর্তৃক আহুত ছাত্র মিছিলের শহর প্রদক্ষিণ কালে জনগণ রাস্তার দুই পাশে ঠাসাঠাসি সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যে উৎসাহ ও উল্লাস ভরে করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিল, তাতেই বুঝা গিয়েছিল জনগণ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য ছাত্রদের আন্দোলনকে কিভাবে দেখছে, ভাষা আন্দোলনে তাদের কি ভূমিকা হবে এবং সে আন্দোলনের সাথে তারা কতদূর পর্যন্ত যাবে।

জনগণের এই রকম আশীর্বাদধন্য ও সমর্থনপুষ্ট মিছিল শহর প্রদক্ষিণ শেষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যে জনসভা করে, সেখানেই বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটি ২১ শের সামগ্রিক কর্মসূচি ঘোষণা করে।

সেই ঘোষণায় অত্যন্ত বলিষ্ঠতা, সামগ্রিকতা ও দূরদর্শিতার সাথে বলা হয়েছিল যে, ২১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ধর্মঘট পালিত হবে; ঐদিন সকাল ১০টায় ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জমায়েত হবে; সেখান থেকে মিছিল করে তারা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে (বর্তমানে যেখানে শহীদ মিনার অবস্থিত) জমায়েত হবে।

তারপর মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণ থেকে মিছিল করে ছাত্ররা আইন পরিষদ ভবনে (জগন্নাথ হলের দুর্ঘটনা কবলিত এসেম্বলি হল) যাবে; সেখানে পূর্বপাকিস্তানের আইন পরিষদকে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের রাষ্ট্রভাষার দাবীর পক্ষে প্রস্তাব পাস করাবে।

৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্র সভায় সোল্লাসে সর্বসম্মতভাবে এই ঐতিহাসিক প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এই সভায় ৪দিন পূর্বে (৩১ জানুয়ারি, ১৯৫২) বার লাইব্রেরিতে গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক তার বক্তৃতায় এই প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

অনেকের অজ্ঞতাপ্রসূত ধারণা যে, ২১ ফেব্রুয়ারি ও ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলন আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয়েছিল, ছাত্রদের উপর পুলিশের অবিমৃশ্যকারী গুলি চালানোর ফলে ২১ উদ্ভব ঘটেছিল, ২১ ও ৫২ ভাষা আন্দোলন ছিল নিছক ছাত্রদের আন্দোলন, ২১ ও ভাষা আন্দোলনের কোনো প্রস্তুতি পর্ব ছিল না, ২১ ও ভাষা আন্দোলন একটি পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের ফল, ২১ ও ৫২ ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি একই ব্যাপারে একই নেতৃত্বাধীন সংগঠন, ২১ ও ৫২'র ভাষা আন্দোলন শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত ছিল ইত্যাদি। ২১ ও ৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস যে কোনো

কারণেই হোক এখনও রচিত হয়নি বলেই ২১ ও ৫২'র ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে এই রকম সব ও অন্যান্য নানা ধারণা ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

২১ ও ৫২'র ভাষা আন্দোলনের বিকাশের গতি পথে ২০ ফেব্রুয়ারি সরকার বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছিল এবং ঐদিনই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ১১-৪ ভোটে সরকার আরোপিত ১৪৪ ধারার বিধি নিষেধ অম্লান বদনে মেনে নিয়েছিল।

শত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ৪ ফেব্রুয়ারিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গৃহীত কর্মসূচি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ছাত্ররা ১৪৪ ধারার সকল বিধি-নিষেধ অমান্য করেই অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। কারণ ৪ ফেব্রুয়ারি তারা যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল সেটা ছিল তাদেরই আন্দোলনের জন্য তাদেরই কর্মসূচি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি সেই গঠিত, বাস্তবসম্মত ও বিপ্লবী কর্মসূচি তাদের কাছে ঐদিন প্রস্তাব আকারে উপস্থিত করেছিলো মাত্র।

অন্যদিকে ৩১ জানুয়ারি যুব লীগের সহযোগিতায় আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে যে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল, তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা হলেও ঐ করিৎকর্মা পরিষদ তার ৩১ জানুয়ারি থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিন সপ্তাহের আয়ুষ্কালে যে ভূমিকা পালন করেছিল, আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে সব পদক্ষেপের জন্য প্রস্তাব করেছিল তা যে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনের সাফল্যের জন্য মোটেই সঠিক, বাস্তবসম্মত, যথাযথ ও বিপ্লবী ছিল না, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ঐ পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের তথা নেতৃত্বের বিপরীতে ঐ পরিষদেরই সংখ্যালঘুদের (যা গঠিত ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটি, যুব লীগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ইউনিয়ন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি হল ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে) মতামত ও নেতৃত্বে পরিচালিত ২১ ফেব্রুয়ারি ও পরবর্তী দিনগুলোর সাফল্যমণ্ডিত কর্মকাণ্ড।

এই হঠাৎ উদ্ভূত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের তিন সপ্তাহের আয়ুষ্কালে অনুষ্ঠিত তিনটি বৈঠকের (৩১ জানুয়ারি, ৬ ফেব্রুয়ারি এবং ২০ ফেব্রুয়ারি) কোনোটিতেই ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের আন্দোলনের ব্যর্থতা, চলমান আন্দোলনের সামগ্রিক অবস্থা, করণীয় ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনার অবকাশ হয় নাই।

এই পরিষদের তৃতীয় এবং সর্বশেষ (২০ ফেব্রুয়ারি বৈঠকে গৃহীত সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার প্রস্তাব ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ছাত্র সভায় গৃহীত না হলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে তত্ত্ব নিজেদের এই প্রস্তাব অনুযায়ীই কেবল নয় বাস্তবে ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত ছাত্রদের দ্বারা তাদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার প্রস্তাব প্রত্যাখাত হওয়ার এবং ঐ দিনগুলোর পর ২২ ফেব্রুয়ারি গায়েবী জানাজার কর্মসূচি সংবলিত প্রচারপত্রে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকৃতির কারণেও এই পরিষদ বাতিল হয়ে গিয়েছিল)। ঐ বৈঠকে আলোচনার একমাত্র বিষয় ও উদ্দেশ্য ছিল– আরোপিত ১৪৪ ধারা মেনে ২১

ফেব্রুয়ারি পালন না করার প্রস্তাব পাস করানো। এই বৈঠকে ৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গৃহীত ২১ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি যাতে পালন না হয়, এই উদ্দেশ্যে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ১৪৪ ধারা মেনে নেওয়ার একটা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, অতীতে মুসলিম লীগও পাকিস্তান অর্জনের কর্মকাণ্ডের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রভাবশালী সদস্যদের দীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ যুক্তিতর্ক ও আলোচনা সত্ত্বেও তাদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার তথা ২১ ফেব্রুয়ারি পালন না করা মহান প্রস্তাব! সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়নি।

যারা ১৪৪ ধারা মেনে নেওয়ার অর্থাৎ ভাষার দাবী, ২১ ফেব্রুয়ারি, কর্মসূচির বিরোধিতা করে, তারা কি একটি জাগ্রত জাতিসত্তার ভাষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য আন্দোলনের নেতৃত্ব হতে পারে? সুতরাং যারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে আরোপিত ১৪৪ধারা অমান্য করেই ভাষা আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তারাই ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের মহান ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বে পরিণত হয়েছিল।

১৪৪ ধারা ভঙ্গে যারা বিরোধিতা করেছিল সেই নেতৃত্ব, অর্থাৎ আওয়ামী লীগ মনে করেছিল, হয়তো ছাত্ররা ১৪৪ ধারার ভয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হবে না; হলেও ছাত্ররা তাদেরই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার প্রস্তাব মেনে নেবে। ২১ ফেব্রুয়ারি গুলি চলার ও তাতে অসংখ্য ছাত্র আহত ও নিহত হওয়ার পর আন্দোলন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না ভেবে এই মহান বাস্তববাদীরা ২২ ফেব্রুয়ারির গায়েবী জানাজার আহ্বান সংবলিত কর্মসূচির দৃঢ়তার সাথে পালন করার পক্ষপাতি ছিল না তারাই যে বাস্তবতা, ছাত্র ও জনগণের চিন্তা-ভাবনার, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার অনেক কাছাকাছি ছিল ঘটনার বিকাশ তা প্রমাণ করেছিল।

কেন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারি সরকার আরোপিত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পথে পা বাড়ালো না এবং কেন তারা ১৪৪ ধারা নির্বিকারে মেনে ভাষা আন্দোলন স্তব্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল? কেবল সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের মূল দল আওয়ামী লীগ না, কমিউনিস্ট পার্টিও ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এ ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে কথাবার্তাও হয়ে থাকাই সম্ভব এবং কমিউনিস্ট পার্টির ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদকে, বিশেষ করে তা নেতৃত্ব আওয়ামী লীগকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। বিপরীতটাও হয়ে থাকতে পারে, অর্থাৎ আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্ত কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে।

আওয়ামী লীগ তথা সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ও কমিউনিস্ট পার্টির ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার প্রধানতম কারণ ছিল যে, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার ফলে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে, যেখানে এক দিকে আন্দোলন তাদের নেতৃত্বাধীন বা আয়ত্বাধীন না থাকতে পারে, অন্যদিকে সেই রকম পরিস্থিতিতে সরকার নির্বাচনের যে সকল কথাবার্তা বলছিল তা রক্ষা না করে দীর্ঘকালের জন্য নির্বাচন পিছিয়ে

দিতে পারে বা তা বাতিল করে দিতে পারে, এমন কি সামরিক শাসনের মতোও কিছু আরোপ করতে পারে।

যে মূল্যায়ন থেকেই হোক, তাদের এই রকম ধারণা বা আকাঙ্ক্ষা বাস্তবসম্মত ছিল না। বরং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের গতিধারায় যা যা ঘটেছিল, তাই ছিল বাস্তব-গর্ভ নিহিত। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের মাধ্যমে ২১ ফেব্রুয়ারি ও তার পরবর্তী অবস্থা এবং তার ফলে ভাষা আন্দোলনের মহান বিজয়ই সরকারকে একদিকে গণবিচ্ছিন্ন, অন্যদিকে ভীত সন্ত্রস্ত করে নির্বাচন ত্বরান্বিত ও অনুষ্ঠিত করতে বাধ্য করেছিল। অন্যান্য কারণের মধ্যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার জন্যই ২১ শের ভাষা আন্দোলন সফল হতে পেরেছিল। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের সফলতার জন্যই ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে ঐ রকম শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত ও পরাজিত করা সম্ভব হয়েছিল। সকল কারণেই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার তথা ২১ শের ভাষা আন্দোলন করতে না চাওয়াটা যে অবস্থার তথা ছাত্র-জনগণের মনোভাবের ও ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার ভ্রান্ত মূল্যায়ন ও অহেতুক আশঙ্কা প্রসূত ছিল, ছাত্রদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ২১ ফেব্রুয়ারি পালন এবং ২২ ফেব্রুয়ারি ছাত্র ও জনগণের গায়েবী জানাজা পড়ার মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের সফলতা এবং বিজয় অর্জনই তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির এই রকম চিন্তা ও মূল্যায়ন সংসদীয় চিন্তার প্রাধান্যের ও তার প্রতি মোহাচ্ছন্নতারও একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অথচ ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ঘোষিত ও বলবৎ থাকা সত্ত্বেও ঢাকা শহরের ২০/২২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়েছিল। ছাত্রদের অতি প্রিয় গাজিউল হকের সভাপতিত্বে সকাল ১১টার দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে সভা শুরু হয়। প্রথমেই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য শামছুল হক সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার প্রস্তাব নানা যুক্তিসহ বিশাল ছাত্রসভায় সঠিক সিদ্ধান্ত হিসেবে ছাত্রদের অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করেন। তার কথা সমবেত ছাত্ররা ধৈর্য সহকারে শুনলো কিন্তু গ্রহণ করলো না।

এরপর সভাপতির আহ্বানে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সংখ্যালঘুদের এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির মুখপাত্র হিসেবে আমি ৪ ফেব্রুয়ারির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২১ ফেব্রুয়ারি এই সভা, সভা শেষে মিছিল সহকারে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে জমায়েত হওয়া, সেখান থেকে আইন পরিষদ ভবনে গিয়ে আইন পরিষদকে দিয়ে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব পাস করানো এবং সেই প্রস্তাবকে ভিত্তি করে দেশব্যাপী দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার পদক্ষেপগুলোকে শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও বাস্তবায়িত করার আহ্বান জানাই এবং বলি যে, আমাদের সেই সঠিক এবং মহান কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমেই কেবল বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা সম্ভব। কিন্তু সে সঠিক এবং মহান কর্মসূচি

বাস্তবায়নের মাধ্যমেই কেবল বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা সম্ভব। কিন্তু সেই সঠিক ও মহান কর্মসূচির অঙ্কুরেই বিনাশ ঘটবে যদি আমরা স্বৈরাচারী শাসকদের উদ্দেশ্যমূলকভাবে আরোপিত ১৪৪ ধারা মেনে নেই। সুতরাং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার জন্য আমাদের কর্তব্য হবে ১৪৪ ধারা অমান্য করা এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রয়োজনেই আমাদের করণীয় হবে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ভ্রান্ত ও চরম ক্ষতিকর প্রস্তাব গ্রহণ না করা।

আমাদের এই রকম যুক্তিভিত্তিক বক্তব্য শেষ হতেই সমবেত ছাত্ররা তুমুল করতালির মাধ্যমে আমাদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানায়। এরপর সভাপতি ঘোষণা করেন যে, এই গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ কর্তৃক ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রেক্ষিতে পরবর্তী করণীয় হবে চার জনের লাইনে সুশৃঙ্খলভাবে মিছিল বের করা। এইভাবে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল হয়ে যায় এবং মিছিল রাস্তায় নেমে পড়ে। অসংখ্য কাঁদুনে গ্যাসের বোমা নিক্ষেপ, লাঠি চার্জ, অগণিত গ্রেফতার সত্ত্বেও সমুদ্রের বিরামহীন ঢেউয়ের আকারে ছাত্ররা গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের শূন্যস্থান পূরণ করতে করতে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্র সভায় গৃহীত ২১ ফেব্রুয়ারি উদযাপনের প্রস্তাবের কর্মসূচিতে দূরদর্শিতা নিহিত ছিল ২১ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত মিছিলের স্তরীকরণের মধ্যে। ঐ দিনের মিছিলকে যদি সরাসরি আইন পরিষদ ভবনে নিয়ে যাওয়ার কর্মসূচি হতো, তাহলে পুলিশের অবিলম্বিত প্রচণ্ড লাঠি চার্জ, কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ ও গ্রেফতারের মাধ্যমে মিছিলকে লণ্ডভণ্ড করা হয়তো সম্ভব হতো। কিন্তু চূড়ান্ত লক্ষ্যস্থল আইন পরিষদ ভবন রাখা সত্ত্বেও মধ্যবর্তী এবং অতি নিকটে একটা অতিরিক্ত অন্তবর্তীকালীন লক্ষ্যস্থল রাখায় ১৪৪ ধারা অমান্যকারী মিছিল, পুলিশের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড আক্রমণের মুখেও পিছনের ছাত্রদের দ্বারা বারবার যেমন পুনর্গঠিত হতে পেরেছিল, অন্যদিকে পুলিশের আক্রমণ উত্তরণকারী মিছিলের সামনের অংশ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শ'তিনেক গজ দূরবর্তী মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে জমায়েত হতে পেরেছিল। এই কারণে পুলিশের পক্ষে শত লাঠিচার্জ, কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ, গ্রেফতার ইত্যাদি দ্বারা ২১ শের মিছিলকে চূড়ান্তভাবে যতবার পর্যুদস্ত ছত্রভঙ্গ করেছে, ততবারই পাইকারী গ্রেফতারের ফলে মিছিলের শূন্যস্থান পূর্ণ হয়ে মিছিল পুনর্গঠিত ও পূর্ণাঙ্গ হতে পেরেছিল।

সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম এবং ১৪৪ধারা ভঙ্গ করে এইভাবে একুশের মিছিলের প্রথমস্থলে পৌঁছাতে পারাটা ছিল ২১ শের ভাষা আন্দোলনের প্রথম ও নির্ধারক বিজয়। সংগ্রামের প্রথম লড়াইতে পরাজিত হলে পরবর্তী লড়াইগুলোও সম্ভব হতো না, বিজয়ের প্রশ্নও থাকতো না। আন্দোলনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ লড়াইতে বিজয়ের ফলে ছাত্ররা যেমন উল্লোসিত ও উৎসাহিত হয়েছিল, তেমনি পরবর্তী ধাপগুলোতেও বিজয়ের অবস্থা সৃষ্টি হয়ে বিজয় সম্পর্কে ছাত্ররা আরো আস্থাশীল

হয়েছিল। অন্যদিকে পুলিশ ও তাদের অভিভাবকরা এই বিজয়ের ফলে পরাজয়ের গ্লানিতে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল।

এই রকম পরিস্থিতিতে মেডিকেল কলেজে সমবেত ছাত্র-ছাত্রীরা যখন মিছিল সহকারে দ্বিতীয় ধাপের, অর্থাৎ আইন পরিষদ ভবনে যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো, সেই সময় ১৪৪ ধারা জারী ও বিদ্যমান সত্ত্বেও মিছিল প্রতিরোধে ব্যর্থ ও নাস্তানাবুদ কর্তৃপক্ষ নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর গুলি চালাবার কাপুরুষোচিত নির্দেশ দেয়। সতর্কীকরণ ছাড়াই মুষলধারে গুলিবর্ষণের ফলে অপ্রস্তুত বিক্ষিপ্ত ছাত্রদের বেশ কয়েক জন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তারা যখন আর উঠলো না, তখনই কেবল তাদের সাথীরা বুঝতে সক্ষম হয় কি ঘটেছে। নিহত-আহতদের তারা ধরাধরি করে মেডিকেল কলেজের সংক্ষিপ্ত পরিচিত পথে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে নিয়ে যেতে থাকে। ঘটনাস্থলেই রফিক ও সালাম নিহত হন, বরকত হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন, অসংখ্য আহতরা মৃত্যুপথযাত্রী হয়ে হাসপাতালে পড়ে থাকেন।

গুলিবর্ষণ ও তাতে বিপুল সংখ্যক ছাত্র আহত-নিহত হওয়ার সংবাদ দাবানলের মতো শহরময় ছড়িয়ে পড়ে। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিরামহীনভাবে হাজার হাজার মর্মাহত মানুষ তাদেরই ভাষার দাবীতে আহত-নিহত বীর ছাত্রদের দেখার জন্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভীড় করতে থাকে।

সংগ্রামরত ছাত্ররা, আন্দোলন ও ছাত্রদের প্রতি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিক সমর্থন দেখে, একদিকে যেমন অভিভূত ও অনুপ্রাণিত হয়, অন্যদিকে তাদের কাছে আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচির রূপরেখা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

তাদেরই একজন আমাকে ২২ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ পরেরদিন গায়েবী জানাজার কর্মসূচি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়কের স্বাক্ষরে অবিলম্বে প্রচার করতে বলে। আমি প্রস্তাবিত কর্মসূচিতে সঠিক, বাস্তবসম্মত ও সময়োচিত করণীয় দেখতে পেয়ে তাকে প্রস্তাবটি তাড়াতাড়ি লিখিত আকারে দিতে বলি।

আমি সেই লিখিত কর্মসূচি স্বাক্ষরের জন্য সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক কাজী গোলাম মাহবুবের কাছে উপস্থিত করি। তিনি ৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তার বক্তৃতার কথা অবলীলাক্রমে ভুলে গিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ ও পরবর্তী কর্মকাণ্ডস্বরূপ মিছিলকে ভুল ও হঠকারী আখ্যায়িত এবং ঐ সবের জন্য আমরা যারা উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলাম তাদের দোষারোপ করে প্রচারপত্রের খসড়ায় স্বাক্ষর দিতে এবং আন্দোলনের সাথে কোনো প্রকার সম্পর্ক রাখতে অস্বীকৃত হলেন।

তবে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ঐ রকম দুর্যোগময় অনিশ্চিত অবস্থায় প্রচার পত্রে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করলেও ভাষার আন্দোলন থেমে থাকেনি। আর অগ্রগতিও ব্যাহত হয়নি। আন্দোলন ব্যাহত করার ক্ষমতা তাদের আগেও বিশেষ ছিল না, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে অস্বীকৃত হয়ে তাদের

ক্ষমতা যেটুকু ছিল, ২২ ফেব্রুয়ারি গায়েবী জানাজার কর্মসূচি দিতে বা কোনো প্রকার কর্মসূচি দিতে অস্বীকৃত হয়ে তাদের কেবল ক্ষমতা নয়, মর্যাদাও শূন্যের কোঠাতে নেমে গিয়েছিল।

২২ ফেব্রুয়ারি গায়েবী জানাজার কর্মসূচি ঘোষণার ফলে সেক্রেটারিয়েট কর্মচারীরা কাজে যোগ না দিয়ে সেখান থেকে হাজার হাজার মিছিল করে সকাল ১০টার মধ্যে আগের দিনের গুলির ঘটনাস্থলে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে গায়েবী জানাযায় সামিল হয়েছিল। ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জমায়েতের মতো ২২ ফেব্রুয়ারিতে ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকা সত্ত্বেও ২০/২২ হাজার ছাত্র ও সাধারণ মানুষ মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে জমায়েত হয়ে গায়েবী জানাজার নামাজ পড়েছিলেন। একদিন আগে ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঐতিহাসিক জমায়েতে কেবল ছিল ছাত্র, আর ২২ ফেব্রুয়ারি মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণের নিহত ছাত্রদের জানাজার জামাতে অধিকাংশ ছিলেন সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে সেক্রেটারিয়েটের সরকারি কর্মচারীবৃন্দ। এই একটি যথাযথ সময়োচিত কর্মসূচির দরুণ একদিন আগের ছাত্রদের বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন জনগণের বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলনে পরিণত হওয়ার পথ পেয়েছিল। ২১ শের আন্দোলন সম্ভব হয়েছিল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্তের কারণে, ২২ শের অভ্যুত্থান সম্ভব হয়েছিল গায়েবী জানাজার সিদ্ধান্তের কারণে। এই দুটো ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির মাধ্যমে সাধারণ ছাত্রদের, আর এ দুটো সিদ্ধান্তেরই বিরোধী ছিল সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। এই দুটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের উদাহরণই বুঝবার জন্য যথেষ্ট যে, কারা ছিল কেবল কথায় নয় বাস্তবেও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে এবং বাস্তবত বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিপরীতে?

২২ ফেব্রুয়ারি গায়েবী জানাযাস্থল থেকে যে মিছিলের সূচনা হয়েছিল তাকেও স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য গুলি বর্ষিত হয়েছিল এবং অনেক লোকও হতাহত হয়েছিল। কিন্তু ফল হয়েছিল বিপরীত। আন্দোলন থেমে যাওয়ার পরিবর্তে আরো ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। আন্দোলন ব্যাপক হয়ে গুণগতভাবে ভিন্ন চরিত্র অর্জনের ফলে অভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তখন সেবাবাহিনীও অকেজো হয়ে পড়ে থাকলে দ্রুত সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে সরিয়ে নেওয়া হয়। এরপর অবস্থা দ্রুত বিক্ষোভকারীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যেতে থাকলে মন্ত্রীরা বাইরে থাকা নিরাপদ মনে না করে ক্যান্টনমেন্টে আশ্রয় নেয়। অভ্যুত্থান শীঘ্রই নির্ধারক শক্তিতে পরিণত হয়। এইভাবে ২২ ফেব্রুয়ারি অভ্যুত্থানের সাফল্যের ফলে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন যে বিজয়ী হয়ে গিয়েছিল তা জনগণ ও সরকার উভয় পক্ষকে বেশ বুঝেছিল। সরকার কর্তৃক বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি তখন আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

ছাত্রদের সূচিত আন্দোলনে জনগণের এই রকম ভূমিকার জন্য ২১ শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল অনেকটা গণতান্ত্রিক চরিত্রের, যদিও

তাতে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্ব অপ্রধান ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি, এমন কি বদরুদ্দিন উমরও ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে নানাভাবে যা বলেন তার অর্থ দাঁড়ায়, ভাষা আন্দোলনের সাফল্য ও বিজয়ের কারণ ছিল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভাষা আন্দোলন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে হওয়া খুবই সম্ভব ছিল, যদি তারা পাকিস্তান, জনগণ এবং জাতির সমস্যাকে সামগ্রিক, যথাযথ ও মার্কসবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতো ও বুঝতো। এসব প্রশ্ন ছাড়াও আন্দোলনের ক্ষেত্রেও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা কি ছিল তা আমরা দেখেছি। এই রকম ভূমিকা যদি নেতৃত্ব হয়, তাহলে এদেশকে কমিউনিস্ট পার্টি সবসময় নেতৃত্ব দিয়েছে! বরং এ দেশের বিভিন্ন আন্দোলনে জনগণ সবসময় পুরোভাগে থেকেছে এবং শ্রমিক শ্রেণির বা তাদের প্রতিভূ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব না থাকার কারণে এক বুর্জোয়ার পরিবর্তে অন্য বুর্জোয়া ক্ষমতাসীন হয়েছে, কমিউনিস্ট পার্টি কখনও তার নেতৃত্ব হয়নি, তার জন্য সেভাবে চেষ্টাও করেনি।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের আন্দোলনই একমাত্র আন্দোলন যার নেতৃত্ব ছিল জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তারা 'আন্দোলনই একমাত্র বিজয়ের জন্য' কমিউনিস্টদের এ কথার সাথে কেবল ছিল না, তাদের নেতৃত্বও মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের অনুপস্থিতিতে উদারনৈতিক ছাত্র ও যুবকরা জাতীয় বুর্জোয়া রূপে নেতৃত্ব হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি ভাষা আন্দোলনে নিজেদের পরিবর্তে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ তথা আওয়ামী লীগের ভূমিকা কি ছিল তা আমরা দেখেছি। সে রকম ভূমিকা তথা নেতৃত্বে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের পরিণতি কি হতো তা বলাই বাহুল্য।

জনগণকে এই রকম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আনা এবং রাখাটাই ছিল ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বের কৃতিত্ব ও সার্থকতা। এই নেতৃত্ব শাসকদের বা বাইরের কোনো শক্তির সাথে সম্পর্ক রাখে নাই তাদের সাথে আপোষের প্রশ্ন তো ওঠেই না, ভেতরের লেজুড়বৃত্তিও করেনি, কিংবা তাদের ভ্রান্তগুলোকে প্রশ্রয়ও দেয়নি। এই কারণেই ভাষা আন্দোলনের মতো সফল, মহান, বিশাল ও নির্ধারক আন্দোলনের নেতৃত্বকে যাকে বুঝার প্রয়োজন হয় না, যাকে না বুঝলেও চলে, যার কে বুঝলো কে বুঝলো না তার জন্য মাথা ব্যথা নেই, যে নেতৃত্ব বিদ্যমান থাকতো কর্মসূচিতে, যে কর্মসূচিকে সাধারণ ছাত্র ও জনগণ মনে করতো তাদেরই কর্মসূচি।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ তথা পরিষদের নেতৃত্ব তাদের ভ্রান্ত কর্মকাণ্ড, জাতির স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা বিরোধী অবাস্তব কর্মসূচি ও গণবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের মহান ভাষা আন্দোলনকে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের মহান ভাষা আন্দোলনের নিষ্ফল পরিণতিতে নিঃশেষিত করতে চেয়েছিল। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের মহান ভাষা আন্দোলন এই শোচনীয় পরিণতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি, মেডিকেল কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি হল প্রতিনিধি এবং যুব লীগের যৌথ বলিষ্ঠ ভূমিকা এবং বিকল্প নেতৃত্বের কারণে। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটি ১৯৪৮

খ্রিস্টাব্দে ভূলুণ্ঠিত ভাষা আন্দোলনের পতাকা তুলে ধরেছিল এবং সেই পতাকাকে সমগ্র জাতির পতাকাতে পরিণত করেছিল সাধারণ ছাত্র ও জনগণের নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণের অবস্থা সৃষ্টি করে এবং তাদের নেতৃত্বের ভূমিকায় এনে। মহান ভাষা আন্দোলনের এ এক অসাধারণ কৃতিত্ব।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল জনগণ ও সাধারণ ছাত্রদের নেতৃত্বে আসতে না দেওয়ার জন্য। ২১ শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ অর্থ ছিল সাধারণ ছাত্রদের নেতৃত্বে আনা, ২২ ফেব্রুয়ারি জানাজার কর্মসূচি দেয়ার অর্থ ছিলে জনগণকে নেতৃত্বে আনা। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এই দুই ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নিজেরা বাতিল ও নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। এই পরিষদ ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনে তাদের মহান নেতৃত্ব স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেনি। ছাত্র ও জনগণ কর্তৃক সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ২১ ফেব্রুয়ারি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ১৪৪ ধারা বিধি নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকার প্রস্তাব প্রত্যাখান ও ২২ ফেব্রুয়ারি পরিষদের নীরবতার ষড়যন্ত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত এবং তারই সাথে তাদের ভূমিকাকে আড়াল করার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। বাস্তব ক্ষেত্রে এই নেতৃত্ব তাদের ভূমিকার জন্য প্রত্যাখ্যাত হলেও ইতিহাসের ক্ষেত্রে তারা সে ভূমিকা আজও আড়াল করে রাখতে সক্ষম হয়েছে। বাস্তবের যথাযথ বিবরণ ও মূল্যায়নই প্রকৃত ইতিহাস।

একুশের তথা ১৯৪৮ পরবর্তী ভাষা আন্দোলনের প্রকৃত নেতৃত্ব জনগণকে নেতৃত্বে আনার মাধ্যমেই একুশে তথা ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পেরেছিল এবং নেতৃত্বের গণতান্ত্রিক ভূমিকার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। জনগণের নেতৃত্বে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের বিজয়ের কারণে জাতি তার অন্যতম প্রধান সম্পদ ভাষাকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। তাই একুশের আন্দোলন মহান ও অমর। এই কারণেই প্রতি বৎসর বসন্তের আবির্ভাবের মতোই একুশ ফুলে ফুলে ভরে ওঠে। সেদিন মানুষ একুশের নীল মুক্ত আকাশের নিচে সমবেত হয়, ছোট-বড়, অখ্যাত-প্রখ্যাত একাকার হয়ে যায়, সেদিন তারা আনন্দিত হয়, শান্তি পায়, স্বস্তিবোধ করে, উদার হয়, গর্ববোধ করে এবং ভাবতে পারে যে, তারা একটি জাতি এবং তারা অনেক কিছুর অধিকারী।

বাংলাদেশে বাংলা ভাষা

হোসনে আরা শাহেদ

'প্রভাত আলো বিকীর্ণ হয় আপন ভাষায়'- রবীন্দ্রনাথের এ কথাটি মাতৃভাষার শ্রেষ্ঠত্ব মনে করিয়ে দেয়। জাতির স্বজাত্যবোধ ও স্বকীয়তার প্রথম ও প্রধান সত্তা হচ্ছে মাতৃভাষা। মাতৃভাষার জন্য বাঙালির আন্দোলন মূলত বাঙালির সত্তা অন্বেষণের আন্দোলন। এ হচ্ছে বাঙালির চিন্তার প্রথম বিদ্রোহ, যা ক্রমান্বয়ে বাঙালির অর্থনৈতিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক শৃঙ্খল মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে সুতীব্র করে তোলে। এ হিসেবে এ বাঙালির পুনর্জাগরণের আন্দোলন। ফারসি, উর্দু, ইংরেজি প্রভৃতি বিদেশি ভাষার বলয় থেকে ম্রিয়মাণ মাতৃভাষাকে মুক্ত করে তার প্রাপ্য মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠার জন্য ইতিহাসে প্রথম জীবনদানকারী বাঙালির রক্তে একুশের জন্ম। একুশ কোনো তারিখ, দিন, ক্ষণ, তিথি নয়, এ হচ্ছে বাঙালির জীবন্ত ইতিহাস- এ ইতিহাস প্রাণ বিসর্জনের মাধ্যমে একটি জাতির মাতৃভাষার অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের সেই রক্তঝরা একুশ আজও রক্তিম আভা ছড়ায় বাঙালির হৃদয়ে। সাক্ষ্য দেয় বাঙালির বলিষ্ঠ চেতনা ও অনমনীয় মনোভাবের।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের পর অনেক বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। বায়ান্ন খ্রিস্টাব্দে জাতীয় যে চেতনা ও আকাঙ্ক্ষার প্রবল প্রকাশ দেখা যায়, তার প্রারম্ভ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে। যে কোনো চেতনা বা বিশ্বাসের পরিস্ফুটন হয় ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। তাই বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন মানে বুঝায় একসময় পরিধি–১৯৪৮ এর মার্চ থেকে ১৯৫২ এর ফেব্রুয়ারি অবধি।

ভাষা আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী সুফল হচ্ছে মাতৃভূমির স্বাধীনতা লাভের চেতনা, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ আর তার সফলতা, স্বাধীনতা সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং বাংলাদেশের সংবিধানে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান। অতঃপর জাতিসংঘ কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসরূপে ঘোষণা। এক চমকপূর্ণ গাঁথার মতো মনে হলেও এ অলীক কিছু নয়– এ পুরোপুরি বাস্তব। অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল আগে আমাদের পূর্বসুরিদের সেই অবিস্মরণীয় আত্মাহুতি আমাদের জন্য এনে দিয়েছে সুবিশাল এই অর্জন-যার পরবর্তী সফলতা বিশেষভাবে নির্ভর করে আছে আমাদের ওপর। এ প্রেক্ষাপটে আমাদের আজকের দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যাবলী বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

স্পষ্টতই প্রশ্ন ওঠে– একুশের মর্মার্থ যে মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, তা যথার্থ হতে পেরেছে কতোটা। এর জবাব সোজা। বাংলা ভাষা সর্বস্তরে সর্বাংশে যে চালু হয়নি বা হতে পারেনি– এ নতুন করে বলার দরকার পড়ে না। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার পর চারটি দশক পার হতে চলেছে, কিন্তু ভাষার প্রতি মনোযোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। মুখে মুখে যে ডামাঢোল বাজানো হয়, তা অন্তঃসারশূন্য। বার্ষিক আবর্তক ভিত্তিতে আতিশয্য প্রদর্শন সম্মান প্রদান হতে পারে না। তাছাড়া শুধু আবেগ দিয়ে কখনও কোনো কাজেও সফল হওয়া যায় না– যদি না থাকে সদিচ্ছা। আবার কেবল সদিচ্ছাও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে না– যদি সংকট থাকে দৃঢ়তার। ভাষা-আন্দোলন অবশ্যই বাঙালির আবেগেরই ফসল, কিন্তু তার সঙ্গে মিশ্রণ ঘটেছিল সংকল্প, নিষ্ঠা ও আপসহীনতার। অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আবশ্যক ধারাবাহিক নিবিষ্টতা ও অবিচল অধ্যবসায়। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা ঘোষণা দানই বাংলা ভাষাকে মর্যাদা দানের শেষ কথা নয়, বরং শুরু। চল্লিশ বছরেও এই মর্যাদাদানের প্রক্রিয়াটি প্রারম্ভিক স্তরই পার হতে পারলো না কেন, এটাই এখনও জ্বলন্ত প্রশ্ন।

অন্য ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার বিরোধ নেই। এ কারণে বাংলাদেশ বিদেশি ভাষাকে অচ্ছুৎ জ্ঞান করার অবকাশ নেই। সে কথাও ওঠে না। এখানে প্রসঙ্গ শুধু বাংলাভাষাকে যথাযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করার এবং সেই সঙ্গে পরিচর্যার। এ ক্ষেত্রেই সৃষ্টি হয়েছে অজস্র জিজ্ঞাসার।

বাংলাভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রক্রিয়া যে প্রত্যাশিত আন্তরিকতার সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে না, তার প্রমাণ সর্বত্র সর্বস্তরে সর্বাংশে বাংলা ভাষা চালুকরণে ব্যর্থতা। ব্যবহারিক জীবনে, শিক্ষাক্ষেত্রে, অফিসে আদালতে– কোথাও বাংলা পূর্ণরূপে চালু হয়নি। বিভিন্ন অফিসে, সরকারি-বেসরকারি যা-ই হোক, এখনও দ্বিধাহীনভাবে

ইংরেজিই চলছে। কোথাও কোথাও বাংলা রাখা হলেও তাতে ইংরেজিরই প্রাধান্য বহাল আছে। এ সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলা ব্যবহারে যথেচ্ছাচার। কোনও কোনও প্রজ্ঞাপনে-বিজ্ঞাপনে বাংলাভাষার অপপ্রয়োগ পরিলক্ষিত। যেমন বিভ্রান্তিকর বাক্যগঠন, সাধু চলিত রূপের মিশ্রণ, বানান-রীতির বিভ্রম। অনেক আদেশ-নির্দেশ, উদ্ধৃতি-বিজ্ঞপ্তি, অসিহৎ-নসিহৎ অর্থাৎ সর্বসাধারণকে অবহিতকরণের বিভিন্ন ব্যবস্থায় পরিদৃষ্ট হয় বাংলা ভাষার বিচিত্র রূপ। বহুল প্রচলিত একটি উদাহরণ হচ্ছে– 'এতদ্বারা জানান যাচ্ছে যে' দিয়ে আরম্ভ করা বাক্য শেষ হয় 'অনুরোধ করা হচ্ছে' দিয়ে। উদাহরণ অজস্র। দপ্তরে বসে যাঁরা এসব লিখছেন, তাঁরা কেউকেটা না হলেও তাঁদের অনুমোদন দানকারীরা অবশ্যই যথার্থ শিক্ষিত। অন্ততপক্ষে স্বল্পশিক্ষিত নন। তাহলে কেন এমন বিভ্রম? মাতৃভাষা বাংলার সাধারণ ব্যবহারের জন্য কি উড়োজাহাজে বয়ে আনা অসাধারণ ডিগ্রির প্রয়োজন? বিদ্যা যথাযথ হলে সাধারণ বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয় পর্যায়ের পাঠই তো যথেষ্ট হওয়া উচিত। ভুলে ভরা দাপ্তরিক নথি ও চিঠিপত্র সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়, কারণ তা সম্ভবই নয়, তবে কি তা অজ্ঞানতাপ্রসূত? তাহলে জানা দরকার, এ সব পদে এমন অযোগ্য লোকের আধিক্য কেন? নইলে ধরে নিতে হবে এ হচ্ছে উদাসীনতা, নয়তো স্বেচ্ছাকৃত উদাসীনতা অবশ্য অযোগ্যতা। আর স্বেচ্ছাকৃত হলে বিশ্বাস করে নিতে হয়, তা হচ্ছে অবজ্ঞা। যে কোনো নিক্তিতেই জনসম্পৃক্ত এমন কাজের জন্য এ ধরনের ত্রুটি অমার্জনীয় হওয়ার কথা।

আদালতে, বিশেষভাবে উচ্চ আদালতে ইংরেজির প্রাধান্য এখনও আকাশছোঁয়া। আর্জি পেশ, রায় লেখা কোনোটাতেই পূর্ণাঙ্গভাবে বাংলাভাষা আজও চালু হয়নি। সত্য বটে, সর্বোচ্চ আদালতে মামলা রুজুর ক্ষেত্রে আইনজীবীদেরকে ইংরেজি বই থেকে নজির উপস্থাপন করতে হয়। ইংরেজি ভাষার বাংলা প্রতিশব্দ থেকে আরম্ভ করে সাঁটলিপিকার ও মুদ্রণ সহকারীর অভাব অন্যতম প্রতিবন্ধক, এ অসত্য নয়। এমন অবস্থায়ও বলতে হয়, এর মধ্যে অতিবাহিত সময়ের মধ্যে বাংলা চালু হওয়ায় বাধা থাকার কথা নয়। কেননা প্রাথমিক পর্যায়ের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠাটা কালক্রমে কষ্টসাধ্য থাকে না।

বাংলা-ভাষাজ্ঞানে দীন দশা ও প্রচলনে অনীহার জন্য মূলত দায়ী আমাদের চলমান শিক্ষা ব্যবস্থা। আমরা জানি, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে আছে: বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা, ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা। বাংলা মাধ্যমে পড়ুয়া শিক্ষার্থী পুরো ছাত্রজীবনে এবং বিশেষভাবে কর্মজীবনে ইংরেজি মাধ্যমে পাঠ গ্রহণকারী শিক্ষার্থীর কাছে মার খেয়ে যায় বলে হীনমন্যতা ও হতাশায় ভোগে একদিকে, অন্যদিকে আক্রান্ত হয় নিরুপায়বোধে। এমন দৃষ্টান্ত নবীন শিক্ষার্থী আর তার অভিভাবকের প্রাণপণ প্রয়াস থাকে বাংলা মাধ্যমকে এড়িয়ে যাওয়ার– ব্যয় সংকুলান দুঃসাধ্য হলেও। ব্যর্থতায় তার ও তাদের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব জেগে থাকে, তাতে আর যাই হোক, বাংলার জন্য ভালোবাসা জিইয়ে রাখা সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়ত, ওপরে বর্ণিত কারণে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের প্রবণতা ছড়িয়ে

পড়ছে উচ্চবিত্তের গণ্ডি ছাড়িয়ে মধ্যবিত্ত, এমন কি নিম্নমধ্যবিত্ত স্তরেও, আর তা বড়বেশি দ্রুত। ইংরেজি মাধ্যমে পড়ে শিক্ষার্থী যে বাংলামুখো হবে না– এ অনুমান করতে ঠিকুজি লাগে না। তৃতীয় যে ধারা, মাদ্রাসা, তার শিক্ষার্থী বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সেবক হবে, এমন কল্পনাও বাতুলতা– বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া। মোট কথা, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ফল দাঁড়াচ্ছে, বাংলা ভাষার জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনাগ্রহ, এমনকি বিরূপতাও সৃষ্টি করা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আমাদের শিক্ষা বিদেশি ভাষার আশ্রয়ে পরজীবী'। আমাদের আজকের অবস্থা অধিকতর করুণ এ কারণে যে, আমাদের সমস্যা এখন বিদেশি ভাষার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশি শিক্ষাসূচিও। দেশীয় শিক্ষাসূচি-বিবর্জিত ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা এখন বাঙালি শিক্ষার্থীর জন্য একেবারেই সারশূন্য। বাংলা মাধ্যমের শিক্ষাসূচিও বিভিন্ন বিষয়ে পরিবর্তনের ও আধুনিকীকরণের নামে এমনই সংক্ষিপ্ত যে, এর পুরো ব্যাপারটিই হয়ে দাঁড়িয়েছে নাম-সর্বস্ব। আজকের বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়-উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর পক্ষেও জানা সম্ভব নয় বাংলাদেশ ও বাংলাভাষাসহ বাংলাদেশের কোনও কিছুরই পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। পাঠক্রমের অসারতার কারণে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, এককথায়, প্রহসনে পরিণত হয়েছে। আর মাতৃভাষার যে সূচি বিভিন্ন শ্রেণিতে, তাতে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নকারীদের মেধা ও মনন এমনই প্রতিফলিত যে, মাতৃভাষা বিষয়টিই শিক্ষার্থীর কাছে সর্বপ্রকার আকর্ষণ হারিয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রের সৃষ্টিকৃত এই বিভাজন প্রকট থেকে প্রকটতর হয়ে ওঠছে দিনে দিনে। শিশুকাল থেকে শিক্ষার্থীর জন্য উদ্ভাবিত এই বিষম বৈষম্য-ব্যবস্থা বাংলা ভাষার জন্য ভয়াবহ হয়ে ওঠছে। দেখা যায়, এখন ঢাকার সকল অংশে ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জয়-জয়কার। উত্তর ঢাকায় ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই সর্বাধিক, বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয় হাতেগোনা মাত্র। সংক্রামক ব্যাধির মতো এখন ছড়িয়ে পড়ছে ঢাকার দক্ষিণাংশেও। স্বাধীনতার আগে ঢাকা মহানগরীতেও ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল এতো বেশি সংখ্যার ছিলো না। ঢাকার অনুসরণে এ ধরনের স্কুল গড়ে ওঠেছে এখন সকল জেলা শহরে। এই শতকের প্রারম্ভের পর কিছুকাল পর্যন্ত এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচিতে ইংরেজি ছাড়া বাংলার কোনো ঠাঁই ছিলো না। কারণ এ জাতীয় স্কুলের পাঠ্যসূচি, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষাপদ্ধতি, পরীক্ষা– এসবে বাংলাদেশের সরকার বা তাদের অন্যকোনও কর্তৃপক্ষের কোনও বক্তব্য থাকে না। তাই ঐ সকল পাঠ্যসূচিতে বাংলা ও বাংলাদেশ নেই। অতি সম্প্রতি বাংলাভাষাকে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে বটে, কিন্তু বলা চলে, তা স্রেফ লোক দেখানো। তার পাঠ্যসূচিসহ পাঠদানপদ্ধতি ভাষা শেখার জন্য যেমন যথেষ্ট নয়, তেমনি নয় বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টির অনুকূল। ঐ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলা পাঠদানকারী শিক্ষককে 'বাংলা ব্যাকগ্রাউন্ডয়ের' বলে অবমূল্যায়িত করা হয়। বাংলাদেশের ইংরেজি স্কুলে বাংলা ভাষার শিক্ষকের মর্যাদা হচ্ছে এই! সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণের ও সুচারু তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থার অভাবে ইংরেজি

প্রধান স্কুলে বাংলা ভাষা ও বাংলা শিক্ষকের তত্ত্বাবধান ও সম্মান দুটোই প্রয়োজনানুগ ও মর্যাদামাফিক হতে পারছে না। জিজ্ঞাসা জাগে, ঢাকা মেগাসিটিতে ইংরেজি মাধ্যমের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমন দ্রুত প্রসার ঘটছে কী করে? এদের স্বীকৃতি দানে কোনও প্রকারের নীতিমালা কাজ করছে?

ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে শিক্ষা-বেতন বাংলা মাধ্যমের চাইতে অনেক গুণ বেশি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য অঙ্কের- একেবারে আকাশচুম্বী। তবু আসন-সংকট হয় না। বরং স্কুল প্রতিবছর শাখা খুলতে বাধ্য হয় ভর্তি-প্রার্থীর চাপে। এসব প্রতিষ্ঠানে কাদের সন্তান পড়ছে, তাদের বিপুল সামর্থ্যের উৎস এবং তাদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য সম্পর্কে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ব্যবস্থা থাকলে আমাদের চলমান সমাজদর্শনের অন্তত একটা স্বচ্ছ দর্পণ পাওয়া সম্ভব হতো। আর সেই সঙ্গে পাওয়া যেতো দারিদ্র্যপীড়িত এ দেশটির অর্থবানদেরও একটি সুস্পষ্ট পরিসংখ্যান। আরও একটি তথ্য আহরিত হতে পারতো যে, কোটি কোটি পাঁজর-সর্বস্ব নিরন্ন মানুষের বাংলাদেশের কষ্টার্জিত দুধে-ভাতে পরিপুষ্ট এই শ্রেণিটি কোন আদর্শে তাদের সন্তানকে চিরতরে সফল বিদেশি হিসেবে তৈরি করতে এমন বদ্ধপরিকর বাংলাদেশেরই ঋণসর্বস্ব অর্থে।

এতে মনে করার কারণ ঘটছে, বাংলা ভাষা নিগৃহীত হচ্ছে বাংলাদেশেরই ধনাঢ্যগোষ্ঠীর হাতে। নিজে টিপসই দানকারী হলেও শুধু ধনসম্পদ তাঁকে সমাজের উচ্চমার্গে পৌঁছে দিয়েছে বলে তিনি সন্তানের জন্য বর্তমানে বাংলাভাষা ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশকে যোগ্য মনে করেন না। বাঙালির রক্তস্নাত একুশে ফেব্রুয়ারি আর এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের এর চাইতে বড় অবমাননা আর কিছু হতে পারে না। পরিতাপের বিষয়, এ ব্যাপারটি আমাদের নীতি-নির্ধারক কর্তৃস্থানীয় কুম্ভকর্ণদের মধ্যে কোনো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে না।

বাংলা মাধ্যমের স্কুলেও বাংলার প্রতি কদর কমে যাচ্ছে। 'অনায়াসলভ্য' মাতৃভাষা বলে এর প্রতি যেনো শিক্ষার্থীদের যত্নবান হওয়ার প্রয়োজন নেই। বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন রুটিনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে বাংলা ক্লাসের সংখ্যা এখন ইংরেজির চাইতে কম। বাংলা পাঠক্রম ও পাঠপদ্ধতিতে গুরুত্ব কমিয়ে আনা হয়েছে অনেক। 'দ্রুতপঠন' বিষয়টি কোণঠাসা– পড়ানোতেও, প্রশ্নপত্রেও। অথচ এই দ্রুতপঠনের অন্যতম লক্ষ্য, নির্ভুলভাবে বাংলা পাঠে সাবলীলতা ও দ্রুততা আনা, সেই সঙ্গে বানানের শুদ্ধতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা। বাংলা উচ্চারণ, পঠন, বাচনভঙ্গি এখন অবহেলিত বলেই বাংলা দ্রুতপঠনের এমন দশা! সাম্প্রতিককালে প্রণীত নীতিমালাতে বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ের পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে বাংলা বানানের অশুদ্ধতা উদারভাবে দেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এর সঙ্গে বাদ দেয়া হয়েছে কবিতা আবৃত্তি শেখানো পর্ব। কিছুকাল আগে থেকেই পরীক্ষায় 'স্মৃতিশক্তি থেকে চরণ উদ্ধৃতি'র প্রশ্ন তুলে দেয়া হয়েছে অনাবশ্যক বিবেচনায়। এমনিতেও টিভি কম্পিউটার ইত্যাদির দৌরাত্ম্যে শিক্ষার্থীর পাঠের অভ্যাস উবে গেছে, এখন ছোটরাও দলে ভিড়েছে। তারা গল্প, ছড়া শোনেও না, পড়েও না। টম এন্ড জেরি,

ডোরেমন, বেনটেন, পোকিমন এমন সব কার্টুনের কল্যাণে তারা বই-ই ধরে না। এমনকি ঐ কার্টুনের বইও না– কেননা তা পড়তে হয়, শুধু চোখে দেখলে চলে না। এ সবের প্রতাপে আমাদের চিরকালের রূপকথার রাজপুত্র, রাজকন্যা, রাক্ষস-খোক্কস, রাখাল, সওদাগর আজকের প্রজন্মের কাছে অচেনা। পরিবেশের এই করাল গ্রাস থেকে শিশুকে বাঁচানো সহজ হতো তার বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে গল্প বলা, পড়া আর শোনার নিয়মিত ব্যবস্থা করে। কিন্তু বিদ্যালয়ে এখন এ দিকটাতে আদপেই দৃষ্টি দেয়া হচ্ছে না।

সমস্যা আছে আরও। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের কথা কমই পরিশীলিত ভাষার হয়, পাঠদান চলে আঞ্চলিক ভাষায়। শিক্ষক নিয়োগে এখন এই বিশেষ বিষয়টি উপেক্ষা করা হয়। এতেই প্রতীয়মান হয় বাংলা মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বাংলাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না আদৌ।

স্বাধীনতার পরে সারাদেশে বেশ কিছু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠার পাশাপাশি কিছুসংখ্যক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম অবশ্যই স্বস্তির। এর ফলে একদিকে উচ্চশিক্ষা বিকাশের পরিবেশ বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ যেমন সৃষ্টি হয়েছে, অন্যদিকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সিটের সীমাবদ্ধতার কারণে সৃষ্ট জটিলতা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা কিছুটা হলেও দেখা দিয়েছে। এছাড়া দেশের মধ্যেই সন্তানের পাঠের সুযোগ অধিকাংশ অভিভাবকের স্নায়ুচাপ কমাতে পারে এবং সর্বার্থে নবপ্রজন্মকে উদ্বেলিত করে তুলতে পারে, এমন আশা করা চলে স্বচ্ছন্দে। কিন্তু এক্ষেত্রেও সংকট। আর তা হচ্ছে বাংলা ভাষা। এ পর্যন্ত সারাদেশে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অর্ধশতাধিকেরও বেশি। এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠের মাধ্যম হচ্ছে ইংরেজি। শিক্ষাক্রমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্তর্ভূক্তি নেই। অতি সম্প্রতি কোনও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে বাংলাভাষা ও সাহিত্য যোগ হয়েছে বটে, কিন্তু তার সংখ্যাও খুব কম। বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার নিদর্শন যেমন এ নয়, তেমনি সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারও এতে প্রতিফলিত নয়। হয়তো আরও সব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ঠাঁই পেতে পারে, তবে জানা কথা, তাও হবে অত্যন্ত ধীর লয়ে। এখানেও প্রকট হয় একটি প্রশ্ন, স্বাধীনতার পরেও বাংলা বিষয় ছাড়া এসব বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন পায় কী করে? কেন বাংলা আবশ্যিক হয়ে ওঠছে না শিক্ষাক্ষেত্রে? পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তক এখনও ইংরেজিতে লেখা। শিক্ষকদের মধ্যেও বহাল আছে ইংরেজিতে বক্তৃতা প্রদানের প্রবণতা।

সাধারণভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, বর্তমানে আমাদের দেশে সর্বত্রই বাংলা সম্পর্কে এক বেদনাদায়ক উদাসীনতা বিরাজ করছে। আমাদের উচ্চবিত্ত শ্রেণির মধ্যে বাংলা শিক্ষা পুরোপুরি বর্জিত। অবশ্য এ প্রবণতা ষাট-সত্তর বছর আগেও ছিলো। বর্তমানে এঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সন্তানকে শুধু উচ্চমূল্যের ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়েই এঁরা তৃপ্ত থাকেন না, নিজেদের ঘরের মধ্যেও ইংরেজির আবহ তৈরি করেন। এঁরা সন্তানকে শৈশব থেকেই ইংরেজির সঙ্গে পরিচিত

করে তুলতে শুরু করেন কথোপকথনে ইংরেজি চালু করে এবং ছবি ও ছড়ার বইসহ খেলাধূলায়ও সার্বক্ষণিক ইংরেজির চর্চা অব্যাহত রেখে। পাশাপাশি বাংলা ব্যবহার তেমন থাকে না বলে শিশু-কিশোর ঐ বয়স থেকেই ইংরেজিকে ভালোবাসে আর বাংলাকে অবজ্ঞা করতে শিখে। বাংলা ভালো না লাগাটা প্রোথিত হয়ে যায় মরমের মধ্যে।

সামাজিক চত্বরে বা দাপ্তরিক কাজে বাংলা লেখাটা পুরোপুরি ঐচ্ছিক। ইংরেজিতেও লেখা যায়, লেখা যায় বাংলায়ও। এ ব্যাপারে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অপার স্বাধীনতা। কৈফিয়ৎ বা জবাবদিহির প্রশ্নই ওঠে না। লজ্জা তো না-ই। ইংরেজির এখনও এমনই শ্রেষ্ঠতা। ইংরেজি এখনও দ্বিতীয় কাতারে যেতে পারছে না একটি বিশেষ মহলের কাছে। এই বিশেষ মহলটিই আবার আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনার ধারক-বাহক ও প্রচারক হয়ে ওঠেছে। এর ফলে বাংলা যে প্রতিষ্ঠা পেতে পারছে না, শুধু তা নয়– বাংলা প্রতিষ্ঠিত হতে বাধাপ্রাপ্তও হচ্ছে। এমন বাধার ধরন ব্যাপক ও বিচিত্র।

যেমন বাংলা বাক্যের মধ্যে ইংরেজি শব্দের মিশ্রণ হালে চালু করা হয়েছে আর তা অত্যুগ্র শৌখিন ধারা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ মিশ্রণটা অভিনব। বেশি পারাটা সম্ভব না হলে অন্তত সো, বাট, নো, নেভার ইয়েস, ওয়েল, বাই দ্য ওয়ে জাতীয় কিছু শব্দ বাক্যের শুরুতে, মধ্যে, শেষে বসানো এখন চমকপ্রদ প্রথা। সম্ভাষণে একনম্বরে হ্যালো, হাই। সুখ, দুঃখ, আনন্দ জাতীয় অনুভূতি প্রকাশে যেনো ইংরেজিটাই বর্তমানে অনেকের কাছে জুতসই। মাই গড, সরি, ওয়েলকাম, সিওর, ওকে– এমন শব্দাবলী বলা যায় এখন একশ্রেণির বাঙালির লব্জ। আবার শুরুতে কিছু বাক্য বাংলায় বলে বাকি সকল বাক্যই ইংরেজিতে বলে বক্তৃতা শেষ করতে অনেক সপ্রতিভ বক্তা সিদ্ধহস্ত। ধরণ আছে আরো। আর তাও অভ্যস্ত; যেমন সম্প্রতি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করতে গিয়ে একজন উচ্চপদস্থ পেশাজীবী ব্যক্তি একটি বেসরকারি টেলিভিশনের চ্যানেলের এক সাক্ষাৎকারে তাঁর মতামত ব্যক্ত করলেন এ ভাষায়: '... দেশের এডুকেশন সিস্টেম এখন টোট্যালি ডেস্ট্রয়েড হয়ে গেছে। অথচ এ ব্যাপারে কারও হেডেক নেই। যাঁরা কনসার্নড, তাঁদের ছেলেমেয়েরা তো থাকছে বিদেশেই!....'

মা-বাবা মম-ড্যাড হয়ে গেছেন অনেক আগেই। এখন মামা, চাচা, ফুপু, খালারাও তাঁদের স্বরূপে নেই। বনে গেছেন আঙ্কেল, আন্টি সর্বত্রই। ঘনিষ্ঠ বা সম্পর্কের, যা-ই হোক, ভাই-বোনেরা সবাই এখন কাজিন, শিশুরাও খোকনসোনা বা খুকুমণি নয় আর, সকলেই সুইটবেবি। সব ধরনের সম্বোধনের মাধুর্য এখন শুষে খাচ্ছে ভিনদেশি ভাষা। গর্ভধারিণী 'মা'- কে ছেড়ে দিয়ে বাঙালি আজ বাস্তবিকই সর্বহারা; অর্থহীন এখন 'মামা-ভাগনে' 'চাচা-ভাতিজার' দ্যোতনা।

ইংরেজি মিশ্রণের আধিক্য এখন ঘরে ঘরে নানাভাবে। 'বেলা হয়ে যাচ্ছে, ওয়াশ রুম হয়ে এসে ডাইনিং টেবিলে বসে পড়ো, কুইক!' কী খাবে বলো, ফ্রাইড না বয়েলড? ফিশ না চিকেন?' সামাজিক ভাষায়ও বাংলার সঙ্গে ইংরেজির মিশাল শুরু হয়ে গেছে,

আর তা বড় বেশি। যেমন: 'তোমার ওয়াইফ কি কোনও জব করেন?' কিংবা 'কোন ধরনের প্রফেশন প্রেফার করেন আপনি?' অথবা 'অনেক ভেবেচিন্তে একটা গিটারই গিফট করলাম ওকে। আফটারঅল ও আমার ক্লোজ তো!' বা 'শোনো, বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি, হায়ার স্টাডিজে অ্যাকচুয়ালি বাংলা স্যুটেবল নয়। বাংলা পরিভাষা মোটেও ইজি না, ইংলিশ-ই বেটার মনে হয়।' গৃহকর্মীর সঙ্গে মেজাজেও ইংরেজি এসে যায়: 'লুক বুয়া, ইদানীং তুমি ডেইলি লেট করে আসছো। আর সিরিয়াসও নও কাজকর্মে তেমন। আমরা খুবই ডিসগাসটেড। আর কিন্তু বেশিদিন টলারেট করবো না বলে দিচ্ছি।'

আজকাল জন্মের তারিখ 'জন্মদিনে' নেই। এর এখন রূপান্তর ঘটেছে 'বার্থডে'-তে। সেই বার্থডে-তে শুভ কামনা নয়, 'উইশ' করতে হয় 'হ্যাপি বার্থ-ডে' বলে। অবস্থা এমন পর্যায়ে গেছে যে, পহেলা বৈশাখে পর্যন্ত 'হ্যাপি নিউ ইয়ার' ধ্বনিত হয় আনন্দঘন কণ্ঠে। তবে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ বাংলা নববর্ষকে কিছুটা বাঁচিয়েছেন 'এসো হে বৈশাখ' গানটি দিয়ে। পয়লা জানুয়ারিতে অবশ্য 'শুভ নববর্ষ' কল্পনাই করা যায় না, ইংরেজির অবমাননা হবে বলে। এমন মিশ্রবাক্য এখন সবখানেই সচল।

এতে সপ্রতিভতা (!) প্রতিভাত হয় বলে জোটে সমর্থন। ফলে এ ধরন ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। প্রচার মাধ্যমগুলো একে যেনো লুফেই নিয়েছে। টেলিভিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দর্শকদের মতামত চেয়ে যে অনুরোধ জানানো হয়, তার ভাষা এ রকম: 'প্লিজ আপনার উত্তর/ভোট/মতামত অত নম্বরে এস.এম.এস-এর মাধ্যমে সেন্ড করুন।' টেলিভিশনের অন্যান্য অনুষ্ঠানের অবস্থাও তথৈবচ। উপস্থাপক, আলোচক, বাইরে থেকে অংশগ্রহণকারী প্রশ্নকারীবৃন্দ তাঁদের কথাবার্তায় বাংলার সঙ্গে অনাবশ্যকভাবে প্রচুর ইংরেজি মিশিয়ে চলেছেন। সরাসরি প্রচারিত অনুষ্ঠানে অধিকাংশ চ্যানেলেই লেখা থাকে 'লাইভ'। কোনও কোনও সংবাদ পর্যালোচনা অনুষ্ঠান নাম পায় 'নিউজ এন্ড ভিউজ।' এমন করে সকল টিভি চ্যানেলে প্রায় সব ধরনের অনুষ্ঠানেই এখন ইংরেজি-বাংলা একত্রে চলছে। টিভি নাটকের সংলাপের অবস্থা একই। রকম সকমে মনে হয় শুধু বাংলায় যেনো ষোলোআনা মনের ভাব প্রকাশ বা বিনিময়ের কোনো উপায় নেই।

মোবাইল ফোনের ইংরেজিতে লেখা বাংলা এস.এম.এস.গুলো বাংলা ভাষার জন্য অশনিসংকেত। ইংরেজি হরফে বাংলা লেখা বাংলা বর্ণের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কা জাগায়। মনে পড়ে যায়, পৃথিবীতে অনেক জাতির মাতৃভাষার বর্ণ বিলীন হয়ে গেছে অন্য ভাষার দাপটে। আরও মনে পড়ে, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের সময় বাংলা ভাষা আরবি হরফে লেখার ষড়যন্ত্র চলেছিলো জোরেসোরে। সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয় ছাত্র জনতা বুদ্ধিজীবীর প্রবল প্রতিরোধে। আরও মনে করিয়ে দেয় পাকিস্তানের শাসক আইয়ুব খানের লিংগুয়া ফ্রাংকাকে– যার লক্ষ্য ছিলো বাংলা ও উর্দু মিশিয়ে একটি যোগাযোগের ভাষা তৈরি করা। প্রত্যক্ষভাবে বাংলা বর্ণের ওপর আঘাত এ না হলেও একে সঙ্গতভাবেই প্রতিহত করা হয় ছাত্র বুদ্ধিজীবীদের তীব্র বিরোধিতায়। কেননা আশঙ্কা ছিলো লিংগুয়া ফ্রাংকার পথ ধরেই

বাংলাকে উর্দু বর্ণে লেখা প্রচলনের। জানা কথা, সূত্রই সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। তাই এমন কোনো কিছুকেই হালকা করে দেখা উচিত নয়। এ কারণে আজকের দিনে ইংরেজি হরফে বাংলা এসএমএস-এ জাগে এতো ভয়! ভয় আরও বেশি হয়ে ধরা দেয় এ কারণে যে, অতীতের বাংলা বর্ণ বিনাশের ষড়যন্ত্র রুখেছেন যারা, তাদের মধ্যে ছাত্র তথা তরুণ সমাজ ছিলো প্রধান শক্তি।

আর আজকের ইংরেজি বর্ণে বাংলা লেখার প্রধান হোতা ছাত্র ও তরুণ সমাজ! ভরসা কোথায় বাংলা ভাষার সুবর্ণ ভবিষ্যতের?

অবশ্য জানা কথা, খালে-বিলে বাঁধ দেয়ার মতো বাঁধ দিয়ে ভাষার প্রবাহ ঠেকানো সম্ভব নয়। ভাষা নদীর মতো চলে নিজের গতিতে। নদীর মতোই ভাঙা-গড়া, বাঁক-নেয়া, সব কিছুতেই তার নিজস্বতা– সেখানে জোর করে কিছু করার অর্থ স্বাভাবিকতা বিনষ্ট করা। অন্যান্য ভাষার মতোই এ তথ্য প্রযোজ্য বাংলা ভাষায়। অনেক আগে থেকেই বাংলা ভাষাও ইংরেজি থেকে প্রচুর শব্দ আত্মস্থ করেছে। বাংলায় আরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে আরবি, ফারসি, উর্দু, হিন্দি, পর্তুগিজ, চীনা, তুর্কি এমন সব ভাষা থেকে বহু শব্দের। এ গ্রহণ প্রক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত; আরোপিত কিংবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়। এ কারণে এমন গ্রহণে ভাষার মূল চরিত্রের বদল ঘটেনি; বরং এমন আত্মীয়করণ ভাষার অন্তর্ভূক্ত হয়ে তাকে সমৃদ্ধ করারই একটি উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন হয়েছে বাংলার সঙ্গে মিশে থাকা বিদেশি শব্দগুলো: চেয়ার, টেবিল, মিটসেফ, রেডিও, হারমোনিয়াম, কেক, পুডিং এমন ধরনের আরও অনেক। একসময়েই যে এসবের অনুপ্রবেশ ঘটেছে তা নয়, ঘটেছে ধীরে ধীরে। ক্রমান্বয়ে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এসে মিশেছে আরও– ফ্রিজ, ফিল্টার, এসি, হিটার, কুলার ওভেন, প্রজেকটার, টু-ইন-ওয়ান, হোন্ডা, ভেসপা। এসব শব্দের বাংলা করা দরকার হয়নি। সাম্প্রতিককালেও অনেক বিদেশি শব্দের আগমন ঘটেছে। যেমন: বার্গার, পিৎজা, চওমিন, সসেজ, শর্মা, ই-মেইল, ফ্যাক্স, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, বেসবল, আইপড, ল্যাপটপ, ব্লেন্ডার, জুসার, গ্রায়ান্ডার, স্কুটি, স্কুটার এমন আরও সব। এসবেরও অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে বাংলা ভাষায় বেশ স্বচ্ছন্দে। বিদেশি বস্তু, খাদ্যদ্রব্য বা প্রযুক্তির বাংলাকরণ প্রয়োজন হয় না, যে দেশে এসব প্রথম তৈরি বা উদ্ভূত, সে দেশের ভাষাই এদের উল্লেখ চলে বলে।

এমন করে ভাষার বিকাশ ঘটে নানা কারণে, নানান সময়ে, একটু একটু করে, অনেকটা যেনো অজান্তে। অনেক শব্দ আবার হারিয়ে গেছে আদৃত না হওয়ায়। এই গ্রহণ বা বর্জন চেষ্টাকৃত নয়, অনেক ইংরেজি বা বিদেশি শব্দের বাংলা করা হলেও তার প্রচলন সম্ভব হয়নি। আবার কোনো কোনো শব্দ উভয় ভাষাতেই চলছে পাশাপাশি। এও চলছে আপনা-আপনিই, চাপিয়ে বসানো হয়নি। এমন করেই ভাষা এগিয়ে চলে, সমৃদ্ধ হয়। কেবল বাংলা নয় পৃথিবীর সব ভাষাই। নদীর মতো ভাঙা-গড়া না থাকলে ভাষার অবস্থা হতো বদ্ধ ডোবার মতো। প্রতিহত করা বা অর্গল বন্ধ রাখা ভাষার বেলায় খাটে না। এ সবই স্বীকৃত এবং গৃহীত তথ্য। এতে আপত্তির কিছু নেই। আপত্তি আজকের যে বিপত্তি, তাতেই। আমাদের এখানে আজকের যে

প্রবণতা, তা স্বাভাবিক নয়। অপ্রয়োজনীয় মিশ্রণের আধিক্য কখনই শুভ হয় না। আমাদের দেশে এখন চলছে এমন সব কৃত্রিম মিশ্রণ– যা যুগপৎ অবাঞ্ছিত এবং অনভিপ্রেত।

বাংলা ভাষার ভাগ্যে ঘোর ঘনঘটা। কেবল মিশ্রণ না, বাংলা উচ্চারণের বিকৃতিও এখন আরেক সমস্যা। এ বিকৃতিটাও হাল আমলের চাল। চিবিয়ে চিবিয়ে বাংলা বলাটা চালু করেছেন অনেকে। এক্ষেত্রে পণ্য সংস্কৃতির বাহক ও প্রচারক এফ.এম.রেডিও-র ভূমিকার কথা সবার আগে উল্লেখে আসে। এফএম রেডিওতে শোনা যায়, ইংরেজির আদলে বাংলা উচ্চারণের অদ্ভুত রূপ। তাদের বাহারি ও বেখাপ্পা মিশালের বিজাতীয় বাংলা কেবল কর্ণ পীড়াদায়কই নয়– হৃদয়বিদারকও। কোনো ব্যাপারে এখন উচ্ছল তরুণদের কণ্ঠে প্রায়ই শোনা যায়– 'অনেক মজা এসে গেছে!' (হিন্দি 'বহুত ম্যযা আ গ্যায়া'-এর আক্ষরিক অনুবাদ।) আজ আনন্দ হবে– এ কথাটির প্রকাশ প্রায়ই এভাবে হয়– 'আজ অনেক মাস্তি হবে!' বাংলা উচ্চারণ বিকৃত করা হচ্ছে বিশেষভাবে 'র' আর 'ড়' নিয়ে; অথবা বিরামচিহ্ন তুলে দিয়ে ভাষায় অস্বাভাবিক দ্রুততা এনে; কিংবা ইংরেজি হিন্দির কায়দায় উচ্চারণ করে। ফলে বাংলা ভাষা তার স্বাভাবিক লালিত্য খুইয়ে সর্বতোভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। মনে করা অসঙ্গত নয় যে, এফ.এম. সংস্কৃতির উদ্দেশ্য হচ্ছে তরুণদের জন্য এক অত্যাশ্চর্য ভাষা তৈরি করা।

এমনি করে দেশের কিছু নব্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও বহিরাগত গণমাধ্যমগুলোর মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী দেশসহ পশ্চিমা দেশগুলোর কিছু কিছু ক্ষতিকর প্রভাব আমাদের ভাষার ওপর পড়ছে– বিশেষভাবে নতুন প্রজন্মের ওপর। একটি শ্রেণি ইংরেজি শব্দের এমন অহেতুক মিশ্রণ ঘটাতে মরিয়া হয়ে ওঠেছে। ধরে নিতে হয়, বাংলা ভাষাকে তারা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেনি; এর প্রতি তাদের ভালোবাসা মুখে মুখেই। এ কারণেই বাংলার সৌন্দর্য আর বিশুদ্ধতায় তাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাবোধ নেই। আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসী প্রভাবে এমন মনোভাব আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার ফলে ভাষা ব্যবহারে অসঙ্গতি ক্রমেই প্রকট আকার ধারণ করেছে। শিশুরা হিন্দি ভাষায় অনূদিত বিভিন্ন কার্টুন দেখে হিন্দিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। বিভিন্ন হিন্দি চ্যানেলের সহজ প্রাপ্যতার ফলে হিন্দিতে আসক্তি জন্মেছে বড়দেরও।

সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণকে যে ক্ষেত্রে বলা হয় গুরুচণ্ডালি দোষ, সেক্ষেত্রে বাংলা ভাষার সঙ্গে ইংরেজি শব্দের মিশ্রণকে নির্বিচারে মেনে নেয়া চলে কীভাবে? আগেই আলোচনা হয়েছে, বাংলা ভাষায় অপরাপর ভাষা থেকে শব্দপুঞ্জের অনুপ্রবেশ নতুন নয়– কিন্তু আজকের যে প্রভাব ও মিশ্রণ এবং বিকৃতি ও কৃত্রিমতার যে আধিক্য, তাতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়, এ প্রভাবের বলয়ে পড়েছি আমরা নিজেরাই– কখনও তথাকথিত জাতে ওঠার খায়েশে, কখনও তথাকথিত সপ্রতিভ হওয়ার অভিলাষে!

মানুষ নতুনত্বের অন্বেষী আর নতুনের পূজারী। যুগে যুগে নতুনকে বরণের মধ্যে দিয়েই এগিয়ে চলেছে মানুষ। কিন্তু তা তো মূলকে স্থির ও স্বাভাবিক রেখে, তবেই।

আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের সমাজে নতুন আসে পুরনোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে নয়, পুরনোকে চুরমার করে দিয়ে। যেমন শাড়ি আজ পরিত্যক্ত। সরু খাটো জিনস, গ্যাবার্ডিনের প্যান্ট আর আঁটসাঁট গভীর ছাঁটের ফতুয়ার সঙ্গে নূপুর, আলতা, মেহেদি, টিপ, অলঙ্কার মিশিয়ে বাঙালি মেয়ে আজ যেভাবে এক আশ্চর্য সাজে সজ্জিত, ঠিক সেভাবে মূল রূপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমাদের মাতৃভাষাকে দুমড়ে-মুচড়ে ইংরেজি হিন্দির কাছাকাছি নিয়ে আসতে একটি মহল অতি উৎসাহী। এইসঙ্গে যোগ হয়েছে আরেক উপসর্গ, তা-ও আধুনিকতার নামে অবশ্য, আঞ্চলিক বাংলার দেদার মিশ্রণ। বাংলা ভাষাকে করে তোলা হচ্ছে জগাখিচুড়ি। বাক্যের মধ্যে বাংলার কিছু শুদ্ধ, কিছু আঞ্চলিক, তার সঙ্গে কিছু ইংরেজি।

এ কথা অবিসংবাদিত সত্য যে, আঞ্চলিক ভাষা আমাদের সম্পদ। এ ভাষা বাংলা ভাষারই দুটো রূপের একটি। এই আঞ্চলিক ভাষা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মাটির মানুষের মুখের ভাষা। বাংলাদেশের ছোট্ট এ ভূখণ্ডে বারো-তেরো কিলোমিটার পরপরই ভাষার বিশিষ্টতা বদলে যায় বলে সৃষ্টি হয়েছে অজস্র আঞ্চলিক ভাষা। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে বাংলা একাডেমি থেকে আঞ্চলিক ভাষার একটি অভিধান প্রকাশিত হয়েছে। ঐ অভিধানটি আমাদের সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। স্বাভাবিক সৌন্দর্যে ভরা হলেও সামাজিক পরিসরে ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার চলে না। সেখানে চলে শিষ্ট চলিত ভাষা (বা মান ভাষা)। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, বক্তৃতা-বিবৃতি, প্রচারমাধ্যম, লেখালেখি, চিঠিপত্র, সাহিত্য সৃষ্টি– সর্বত্র ভাষার এ রূপেরই প্রয়োগ। ভাষার এ উভয় ধরনের মিশ্রণ দূষণীয়। কারণ এ অসুন্দর করে তোলে ভাষার উভয় রূপকেই। সে সঙ্গে হয়ে পড়ে শ্রুতিকটুও। বাংলা ভাষার লিখিত দুই রূপ সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ যেমন ভাষার সুষমা আর বিশুদ্ধতার জন্য গ্রহণীয় নয়, ঠিক তেমন ভাবেই গ্রহণীয় নয় ভাষার শুদ্ধরূপের সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষার মিশ্রণ।

কথ্য ভাষার উভয় রূপের মিশ্রণের এই প্রভাব ছিলো না কিছুকাল আগেও। সাম্প্রতিককালেই এ আরম্ভ হয়েছে এবং গত এক দেড় দশকে দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। মনে হয়, আজকের দিনে আর সবক্ষেত্রে উগ্র অত্যাধুনিকতা যেমন সমাজের সহজ ও শালীন ভাবকে গ্রাস করে ফেলতে চাইছে, ঠিক তেমনি ভাষার এই দুই রূপের অশোভন মিশ্রণের প্রবণতা ভাষাকে অসুন্দর করে তুলতে ব্যগ্র হয়ে ওঠেছে। গোষ্ঠীবিশেষের এ উচ্ছৃঙ্খলতা স্পর্শ করছে অনেককে। শিক্ষায়তনগুলোতে মাত্র তিন-চার দশক আগেও শিক্ষক-শিক্ষার্থী যথাসম্ভব শুদ্ধ ভাষায়ই কথা বলতে যথাসাধ্য সচেষ্ট ছিলেন, আজ এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না কেউই। সরকারি-বেসরকারি কর্মস্থলে, দোকানপাটে, রাস্তাঘাটে, সভা-সমাবেশে, সামাজিক অনুষ্ঠানে, এমনকি বক্তৃতামালায়ও অধিকাংশ মানুষের কথাবার্তায় আঞ্চলিকতা থাকে। যেখানে বাংলাদেশের বৈচিত্র্যপূর্ণ আঞ্চলিক ভাষা আমাদের সম্পদ, যেখানে তার স্বকীয়তা রক্ষার জন্য আমদের সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য, সেখানে তা না করে উল্টো তাকে নিয়ে অমন মিশ্ররূপ সৃষ্টি বাংলাভাষার জন্য বিড়ম্বনারই কারণ। প্রচার মাধ্যমে নির্ভুল

বাংলায় ও শুদ্ধ উচ্চারণে খুব কম আলোচনা অনুষ্ঠান বা নাটক প্রচারিত হয়। এমন ধারা চলচ্চিত্রে দেখা যায় আরও অধিক মাত্রায়। স্বাভাবিকভাবেই রেডিও টেলিভিশনের ও চলচ্চিত্রের প্রভাব নতুন প্রজন্মের মধ্যে খুব বেশিই হয়। আজকের কিশোর, প্রাক-তরুণ ও তরুণ সমাজের পারস্পরিক আলোচনার ভাষা ইংরেজি, হিন্দি ও আঞ্চলিকতা-মেশানো পাঁচমিশালি বাংলা। অনেকে আবার এমনও আছে, যারা বাংলায় কথা বললে বলে আঞ্চলিক বাংলায়, নয়তো ইংরেজিতে।

বাইরের প্রভাব এমন করে যে, এ প্রজন্মকে সম্মোহিত করতে পারছে, তার কারণ তাদের ভেতরের ভিতটা নড়বড়ে। শৈশবে-কৈশোরে এ কালের শিশু শিক্ষার্থী বাংলা বর্ণের সঙ্গে তেমন করে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারছে না আমাদের শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থাপনার বদৌলতে। নিচু ক্লাসে হাতের লেখা সুন্দর করার জন্য যে যত্ন নেয়া হয়েছে দূর অতীতে, তেমন দূরও আবার নয় অবশ্য, আজ তা ওঠে গেছে। ভালো ছাঁদের হাতের লেখা মক্শ করানো হারিয়েছে, খাতার পাতা ভরে হাতের লেখা ‘বাড়ির কাজ’ ‘শ্রেণির কাজ’ হিসেবে আবশ্যিক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এর ফলে শিশুর সঙ্গে বাংলা বর্ণের চমৎকার মিতালি গড়ে ওঠেছে, বর্ণকে সে ভালোবাসতে শিখেছে, শিখেছে এর হতশ্রীতায় বা বিকৃতিতে আঁতকে ওঠতে। আর এক অতি আবশ্যকীয় বিষয় ছিলো শ্রুতলিখন, যা একই বর্ণের সৌন্দর্য ও বানানের শুদ্ধতার জন্য বিশেষ প্রয়োজন। বিশ্বের সর্বত্র তো বটেই, আমাদের দেশেরও ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে এ প্রথা আজও অটুট আছে, অথচ বাংলা মাধ্যমে নেই। বাংলা বর্ণ, শব্দ, বাক্য প্রতিটি ব্যাপারেই যে বাঙালি সন্তান ক্রমেই বেপরোয়া হয়ে ওঠছে, হারাচ্ছে ন্যূনতম মমত্ববোধ, তা প্রধানত এ কারণেই। এমন সব কারণেই বাংলা ভাষার অশুদ্ধি ও বিকৃতি তাদের ক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদী করে না, বরং করে তোলে ত্বরিৎ অনুসারী। নির্বিকার পরিবেশ তাদের উৎসাহিত করে তুলছে অতিমাত্রায়। বাংলা ভাষার অভিভাবক আসলেই কোথাও নেই!

বাংলা বানানের স্বেচ্ছাচারিতা আরেক উপসর্গ। বানান বিভ্রমের প্রকোপ সর্বত্র। প্রাচীরপত্রে, প্রচারপত্রে, ব্যানারে, বিলবোর্ডে, সাইনবোর্ডে, সড়কের নাম লিখনে, সরকারি বিভিন্ন জরুরি বক্তব্য-সম্বলিত বোর্ডে, গাছপালা বাগান ধ্বংস না করার অনুরোধে, প্রচার মাধ্যমের ও পত্রপত্রিকার বিজ্ঞপ্তিতে, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের ভূমিকালিপিতে অর্থাৎ সবখানে অজস্র বানানবিভ্রাট। এ অবাক করার মতো ব্যাপার। বানানের ভুল থাকে অনুষ্ঠানের নামে, শ্রদ্ধাঞ্জলিতে, বাড়িঘর জায়গাজমির নিবন্ধনপত্রে, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মুদ্রিত নীতিমালাতে।

আশ্চর্য হলেও সত্য, ভুল থাকে ব্যক্তির নিজের নামের বানানে। ব্যক্তিগত নামে বানান-বিচ্যুতির জন্য অনেক যুক্তি খাড়া করা হয়– কখনো ‘উচ্চারণের স্বার্থে’, কখনও প্রবেশিকা/এসএসসির নাম শিক্ষাবোর্ডে নিবন্ধনের সময় ‘স্কুলের অফিসের অজ্ঞতার’ অজুহাতে। রক্ষা, বাঙালি মুসলমানের নামে বাংলার স্থান নগণ্য। বিদেশি শব্দের বানান তো বাংলায় যেকোনোভাবে হতে পারে। একে খেয়ালিপনা বলা গেলেও ভুল করার কি উপায় থাকে!

বানানের বিপর্যয় ঘটে সৃজনশীল গ্রন্থের নামকরণে খোদ গ্রন্থকারের ইচ্ছাতে। এ রকম বিপর্যয় সৃষ্টিকারীরা কেন যেন বিস্মৃত হন, গ্রন্থ কোনো পণ্যের বিজ্ঞপ্তি নয় যে, বাণিজ্যিক কৌশলের স্বার্থে বানান ওলট-পালট করা জায়েজ হতে পারে। ব্যতিক্রম হতে গিয়ে লক্ষ্য করেন না যে, তিনি নিজেই উদাহরণ হয়ে যাচ্ছেন এক অশুভ কাজের।

প্রকাশক ও লেখকদের মধ্যেও যে বাংলা বানান ও বাক্যগঠনের নিয়ম সম্পর্কে গাফেলতি আছে, তা অস্বীকারের জো নেই, এড়িয়ে যাওয়ার তো নয়ই। প্রুফ যত্নের সঙ্গে দেখার বালাই থাকে না, বিশেষভাবে একুশের গ্রন্থমেলায়। তাড়াহুড়া করে বই ছাপা শেষ করে বাঁধাই করে কতো শীগগীর মেলায় পৌঁছানো যায়, চলে তার প্রতিযোগিতা। বাণিজ্যের স্বার্থে এ আপত্তিকর অবশ্যই নয়, নিন্দনীয় হচ্ছে গ্রন্থের বানান ও মুদ্রণবিভ্রাট সম্পর্কে যত্নবান না হওয়া। হতে পারে সকল গ্রন্থই সমভাবে বিভ্রমে আক্রান্ত নয়, তবে অস্বীকারের উপায় নেই, কম-বেশি বিভ্রমকারীদের সংখ্যা একেবারে কম নয়। যতো কমই হোক, এর পরিণাম বহুদূর বিস্তৃত হতে বাধ্য। ছাপার অক্ষরে কি কখনও ভুল থাকতে পারে, এ হচ্ছে আমাদের এ অনগ্রসর দেশের হতভাগ্য সুশিক্ষাবঞ্চিতদের বিশ্বাস ও ভাষ্য। ফলে স্বাভাবিকভাবেই গ্রন্থের বানান বা ভাষার বিভ্রান্তি তাদের কাছে হয়ে পড়ছে আদর্শ এবং বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণীয়। কেবল বই মেলায় প্রকাশিত বই-ই নয়, বছরজুড়ে প্রকাশিত অধিকাংশ গ্রন্থই বিভ্রম-বিভ্রান্তি বিবর্জিত নয়। বরং বলা যায় জোর দিয়ে, নির্ভুল বানানের এবং মুদ্রণ-বিভ্রাটবিহীন বইয়ের হার আমাদের দেশে কত, তা উল্লেখ করতে গেলে লজ্জাই পেতে হবে। কারণ হচ্ছে প্রকাশক ও লেখক উভয়েই অমনোযোগী; এ বিষয়টাকে তাঁদের কোনো গুরুত্বই না দেয়া। এর ফলে বাংলা বানান, বাংলা ভাষার শুদ্ধতা যেন জালের জটিল প্যাঁচে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এই প্যাঁচ বাংলাভাষাকে সমূহসর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিশেষভাবে শিশুতোষ গ্রন্থের বানান ও মুদ্রণবিভ্রান্তি ভয়ঙ্কর পরিণামবহ হয় বলে শঙ্কা শতরূপে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বানানের নৈরাজ্যের অন্যদিকও আছে– বানান ভেদ; অর্থাৎ একই বানানে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। একই শব্দের একাধিক বানান দেখা যায় পাঠ্যপুস্তকে, গ্রন্থাবলীতে, সংবাদপত্রে। যেমন বাড়ী/বাড়ি, মুনসিঞ্জ/মুনসীগঞ্জ, কাওরান বাজার/কারওয়ান বাজার, বৈচিত্র্য/বৈচিত্র, উজ্জ্বল/উজ্জল– এমনি হাজারো। এ নিয়ে কোনও ভাবনা চিন্তা পরিলক্ষিত হয় না বা এর বিরুদ্ধে কোনো সতর্ক-কথাও উচ্চারিত হয় না। এমনিতেই সুদূর অতীত থেকে বহু বিদেশি শব্দ আত্মস্থ করার ফলে এবং বিশেষভাবে সাধুর পাশাপাশি চলিত ভাষার বিকাশে বাংলা বানানে বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান। এরপরেও এতোকাল তবু তৎসম তদ্ভব শব্দের বানান অবিকৃত রাখা সম্ভব হয়েছিল, এখন আর তা-ও থাকছে না। অর্থাৎ বাংলা বানানের এখন 'যেমন খুশি তেমন সাজোর' মতো অপার স্বাধীনতা– কোথাও কেউ নেই নিয়ন্ত্রণের জন্য, সমাধানের প্রয়াস তো দূরের কথা।

আছে বৈকি– বাংলা একাডেমি! বাংলা বানানের বিশৃঙ্খলা রোধে এই একাডেমির ভূমিকাই হতে হবে অগ্রণী। কিন্তু সেখানেও ধোঁয়াটে ভাব! বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত গ্রন্থে ক্রিয়াপদের রূপে কিছু বিসদৃশ চোখে পড়ে। তাদের প্রকাশিত পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত অভিধানে একাধিক 'বিকল্প' বিদ্যমান– কোনটি গ্রহণযোগ্য, প্রায় ক্ষেত্রে তার উল্লেখ ছাড়াই। উপরন্তু দেখা যায়, বাংলা একাডেমি নিজেই তার প্রবর্তিত প্রমিত বানানের নিয়মের অনুসারী সর্বত্র নয়।

বাক্যগঠনসহ বানান, উচ্চারণ সবকিছুতে বাংলা ভাষার এ দুর্দশা নির্বিচারে পার পেতে যে পারছে, তা প্রশ্নের উদ্রেক করেছে স্বল্প-সংখ্যক সচেতন গোষ্ঠীর মধ্যে। উপরন্তু এর বিপরীত প্রভাব পড়েছে সর্বত্র নতুন করে। যাঁরা পরম উৎসাহে স্বাধীনতার পরপর বাংলা প্রেমে মজেছিলেন, অবস্থাদৃষ্টে তাঁরা ধীরে ধীরে সেই চেতনা থেকে সরে আসছেন। অনেকেই এখন চতুর্থগুণ উৎসাহে ইংরেজিকে পুনরায় আলিঙ্গন করা আরম্ভ করেছেন। বিয়ে আকিকা জন্মদিনের নিমন্ত্রণকার্ড থেকে শুরু করে যাবতীয় সভা সেমিনারে আমন্ত্রণকার্ডও এখন লেখা হচ্ছে ইংরেজিতে। চিকিৎসক বিধানপত্র বাংলায় লেখা আবার ছেড়ে দিয়েছেন, বিপণিবিতানের অধিকারী তাঁর বিল, রশিদ ও হিসাবের খাতাপত্রকে পুনরায় ইংরেজিতে রূপান্তরিত করেছেন। দোকানপাটের সাইনবোর্ডে, গাড়ির নম্বরে, বাসা বাড়ির নামফলকে সগৌরবে ইংরেজির প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। আর নামকরণ! সন্তানের নামের অর্ধেক হলেও বাংলায় রাখার যে জোয়ার এসেছিল সদ্যস্বাধীন দেশে, এখন তাতে ভাটা পড়েছে। নতুন উদ্দীপনায় এখন শুধু ইংরেজি নয়, দুনিয়ার যাবতীয় ভাষায় শিশুর নামের আকিকা হচ্ছে। বাড়ি-ঘর, আবাসিক গৃহনির্মাণ প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বিপণিবিতান, বীমা-ব্যাংক, শিল্পকারখানা, তৈরি-পোশাক কোম্পানি সবকিছুতেই নাম এখন আবার ইংরেজি। বহুতল আবাসিক ভবনের নামও এখন ইংরেজির, ক্ষেত্র বিশেষে অন্যভাষার প্রাধান্য। ইংরেজি নামকরণে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থান শীর্ষে। ইংরেজির অবাধ প্রবেশ এখন 'মেগাশপ' বলে পরিচিত দোকানগুলোতে। দোকানের নাম বাংলায় হয় যদিওবা, ভেতরে ইংরেজিতে ভরা। খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে প্রসাধনী তৈজসপত্র পর্যন্ত সর্বত্র ইংরেজি নামের লেবেল সাঁটা।

ধারণা জন্মেছে, কেবল ধারণা নয়– বিশ্বাস,বাংলার মধ্যে সেই চমক নেই যা ইংরেজিতে আছে। এই বোধে প্রবলভাবে আচ্ছন্ন সাম্প্রতিককালে ইংরেজির প্রেমিকবর্গ। কোম্পানির ও ব্রিটিশ আমলে ইংরেজি-বোলের বাঙালির মূল্যমান যেমন 'নেটিভ'দের কাছে হু হু করে বেড়ে যেতো, তেমন অবস্থা ফিরে এসেছে এই স্বাধীন বাংলাদেশে আড়াইশ বছরের অধিককাল পরে আবারও নাটকে চলচ্চিত্রে আজকাল নায়ক-নায়িকার মধ্যে ভাববিনিময় করানো হয় 'আই লাভ ইউ' সংলাপ দিয়ে– যাতে প্রেমের মূর্ছনা দ্বিগুণ মাত্রার হতে পারে, বোধহয় এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে। হায়রে বাংলা ভাষা! অনুকরণের আড়ম্বরে বুঝি হারিয়ে যেতে চলেছে তার চিরমধুর শব্দ 'ভালোবাসা'!

ঠগ বাছতে গেলে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে– কাকে ফেলে কাকে ঠোকা যাবে? এখন দেখা যাচ্ছে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মধ্যেও ইংরেজিপ্রীতি প্রবণতা। আমরা দেখি 'ব্যাচেলর', 'আই লাভ ইউ', 'কিং নাম্বার ওয়ান', 'থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার', 'মেড ইন বাংলাদেশ' এমন সব নামের বাংলা ছায়াছবি। টেলিভিশনের নাটকেও এখন ইংরেজি নামের আবির্ভাব: 'সিক্সটি নাইন', 'হাউজফুল', 'দ্যা ফ্যামিলি', 'নাইন মানথ ইন ব্রিকলেন' 'গ্রাজুয়েট' এসব। সৃজনশীল কর্মের কোনও শাখাই এখন ইংরেজি বিমুখ নয়। ইংরেজি শব্দ কব্জা করেছে এখন আমাদের কবিদেরও হৃদয়! আর কথা সাহিত্যে? 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস' পুরস্কারটি পেয়েছে ইংরেজি নামের (নেক্রোপলিস) একটি বাংলা উপন্যাস। আমাদের চিত্রশিল্পীদের একটি বড় অংশেরই পছন্দ তাঁদের শিল্পকর্মের (আঁকা ছবির) নাম ইংরেজিতে দেয়া। এসবের মানে ঠিক বোধগম্য হয় না। বাংলা ভাষার ভাণ্ডার তো এতো শূন্য হওয়ার কথা না! সৃষ্টিশীল মনেও মাতৃভাষার ঠাঁই হয় না– এ তথ্য ধারণ করতে মন আসলেই চায় না।

প্রশ্ন উঠতে পারে– এ তো অন্ধ ইংরেজি মোহ নয়, এ হচ্ছে শৈল্পিক সত্তার স্বাধীনতা, যা কার্যকারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু শিল্পসচেতনতায় মাতৃভাষা আবেদন সৃষ্টি করবে না– এওবা কেমন কথা! বিশেষত অবহেলিত এ মাতৃভাষাকে নিয়ে যে বেদনা ও ক্ষোভ, তা অকারণ নয়। আর তা কারও অজানাও নয়। এ জন্যই রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। একে দূর করাটা যে যেখানে আছেন, সকলেরই দায়। আজও বাংলা নিয়ে পরোক্ষ উদাসীনতা (যদি তাচ্ছিল্য না-ই বলা হয়) কম নয়। যিনি বাংলা জানেন না, বাঙালি হয়েও বাঙালি সমাজে তিনি লজ্জিত নন। বরং ক্ষেত্রবিশেষে উচ্চকণ্ঠ: 'বাংলা আমার আসে না'। এই শ্রেণির মানুষই তাঁদের লেখা ইংরেজি পত্র বা প্রবন্ধ লিখে পাঠান বাংলা পত্র-পত্রিকায় অবলীলাক্রমে অনুরোধ জানিয়ে: অনুগ্রহ করে বাংলায় অনুবাদ করে ছাপাতে। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান কালের উন্নাসিক শ্রেণির প্রতিধ্বনি যেন তাঁদের কণ্ঠে।

প্রকৃত বিচারে বাংলা ভাষার আজ ভয়ঙ্কর দুর্দিন। আগে তবু কিছু প্রতিবাদী ছিলেন, ছিলেন সংস্কারক, পথ-প্রদর্শক। ছিল আত্মাহুতি দেয়ার মতো সাহস। আজ? আজ সকলেই যেন একই পথের পথিক। ভাষা আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল উচ্চশিক্ষায় বাংলা প্রবর্তন, আর আজকের স্বাধীন বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা থেকেই ঘটতে চলেছে বাংলার নির্বাসন। বাংলা ভাষা নিয়ে সফলতা অর্জনের এবং একুশে ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভের মাহেন্দ্রক্ষণে এ কি বিমূঢ়তা আমাদের? যে বাংলা ভাষার জন্য বাঙালি, যে বাঙালির জন্য বাংলাদেশ আর তার স্বাধীন লাল-সবুজ পতাকা, সেই বাংলাদেশে বাংলাভাষাকে কেন এমন ন্যাক্কারজনকভাবে পদে পদে অবমাননা? বাংলাকে কোণঠাসা করার চেষ্টা? বাংলাপ্রেমী, বাংলা সংস্কৃতিসেবীদের পেছনের সারিতে স্থান নির্ধারণ করা? ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ফজলুর রহমান ও তার সঙ্গীসাথীরা আজ অনেকেই মৃত হলেও, তাদের আরবি বর্ণে বাংলা লেখার অপপ্রয়াস ব্যর্থ হলেও, আজ অন্যরূপে অন্য বর্ণসংস্কৃতি মিশ্রণের চলছে অলক্ষ্য অশুভ পায়তারা। 'লিংগুয়া ফ্রাংকা'–ও নির্দোষভাবে (!)

প্রবর্তনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে দূরদর্শী বাঙালির নির্ভীকতায়– আজ সেই ভবিষ্যৎদর্শন, সেই সৎসাহস গেলো কোথায়? কঠোর অপ্রিয় এ তথ্যগুলো গভীরভাবে মনে ভাবনা জাগায়।

ওপরে আলোচিত হয়েছে, বিশেষভাবে উচ্চবিত্তদের শিক্ষিত তরুণ সমাজে অবিমিশ্র বিশুদ্ধ বাংলা প্রায় অচল। এ প্রবণতা প্রসারিত করা হচ্ছে সাধারণ সচ্ছল পরিবারের শিশু-কিশোরদের মধ্যেও। অর্থাৎ সামর্থ্যপুষ্ট পর্যায়ের অধিকাংশ পরিবারই এখন বাংলা অক্ষরজ্ঞানহীন। বাংলা ভাষাকে কি কেবল অসহায় তথাকথিত নিম্নশ্রেণির জন্যই নির্ধারিত করা হচ্ছে প্রকারান্তরে? বাংলা ভাষা সম্পর্কে অনেক পরিকল্পনার কথা শোনা গেছে– এর প্রমিতরূপ পৌঁছে দেওয়া হবে বাংলার ঘরে ঘরে, এমন আশার ফানুসও সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে অনেক ওড়ানো হয়েছে। আজ? সবই ব্যর্থ, সকলেই আত্মসেবায় মত্ত। বাংলার অবস্থা যে করুণ থেকে করুণতর হতে যাচ্ছে এ ব্যাপারে সকলেই যেন অন্ধ। কারও নজরে আসছে না তরুণ সমাজই আজ দেশ ও ভাষা নিয়ে সর্বাধিক বিভ্রান্ত। এমন একজন কিশোর বা প্রাক-তরুণ খুঁজে বের করা কঠিন, যার মধ্যে এসএসসি, এইচএসসি অতিক্রমের পর দেশে থাকার বাসনা আছে। সুযোগের জন্য সে পা বাড়িয়ে থাকে– চলে যাবে 'সব পেয়েছির দেশে'। তাই বাংলা ভাষা তাকে টানে না, এর ওপর পরোক্ষ আঘাত ও প্রত্যক্ষ অবহেলা তাকে বিচলিত করে না। একুশে ফেব্রুয়ারি মানে সে বুঝে বইমেলা। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো গান' তার ভালো লাগে কথা ও সুরের জন্য। ভাষা আন্দোলনের কথা তার কাছে কাহিনির মতো। এ তাকে আলোড়িত করে না। কারণ তার ঘরে, পরিবারে, সে ভাষা আন্দোলনের কথা শোনে না।

ভিন্ন চিত্র নয় নিম্ন মধ্যবিত্তের সন্তানেরও। জীবনের টানাপোড়ন তাকে নিরন্তর ক্ষত-বিক্ষত করে বলে সে-ও বাঁচার স্বপ্ন দেখে বিদেশে গিয়ে। ভাষা ও ভাষা- আন্দোলন তার মননে মগজে নেই, কারণ তার পরিবেশে, পরিবারে এ সম্পর্কে সে শোনেনি, জানেনি। এ কারণে ভাষা আন্দোলন তার মধ্যে আকর্ষণ তো দূরের কথা, কৌতূহলও জাগাতে পারেনি।

আর বিত্তহীন কিশোর বা তরুণ তো জানেই না ভাষা আন্দোলন কী। বড় জোর বুঝে 'দেশ স্বাধীন', তা-ও বুঝে না স্বাধীনতা কাকে বলে। তাতে তার আক্ষেপ নেই, কারণ তার গ্রামীণ পরিবেশে ভাষা আন্দোলনের কথা কেউ জানে না। বলাবলিও করতে দেখে না। পুঁথি অথবা জারি বা সারি গানের কিংবা আর কোনও ধরনের লোকজন গানের মাধ্যমে তার কাছে ভাষা আন্দোলন পৌঁছায়নি। ভাষা আন্দোলনের যে ভাষা, সে সম্পর্কেও তার বোধ নেই। তার কাছে প্রমিত ভাষা বা ভাষার শুদ্ধরূপ– এ সবই অচেনা।

এই যদি হয় স্বাধীন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের বাংলা ভাষা ও ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে জ্ঞানের চিত্র, তাহলে কী থাকছে অবশিষ্ট? কাদের ওপর আমাদের তবে নির্ভরতা? কাদের কাছে বাংলা ভাষার নিরাপত্তা?

একথা সত্য, ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে যে আলোচনা, তা মূলত সীমিত হয়ে আছে ভাষাসচেতনগোষ্ঠীর মধ্যে। অন্তত আবর্তকভিত্তিতে হলেও ফেব্রুয়ারিতে তাঁরা সুযোগ পান যা হোক আলোচনার, পরিকল্পনার। এঁদের সংখ্যাও অবশ্য কমে আসছে। বাকিদের মধ্যে, তাঁরা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হলেও, এ সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা, এমনকি সাধারণ কৌতূহলও দেখা দেয় না। নির্বিকার এ পরিবেশ মারাত্মক হয়ে ওঠেছে শিশু, কিশোর ও অতি তরুণ সম্প্রদায়ের জন্য। তাদের ঘরে-বাইরে, পরিবেশে ভাষা আন্দোলন নেই। পরিবার হচ্ছে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অথচ পরিবারেই ভাষা আন্দোলন বা একুশ অনুপস্থিত। পাঠ্যসূচিতে গতানুগতিকভাবে ভাষা সংগ্রাম আসে বটে, কিন্তু বিদ্যালয়ে এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ প্রাধান্য থাকে না বলে সাদামাটা পাঠ শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করে না। শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনার্থে শহিদ মিনারে যে ফুল দেওয়ানো হয়, তাতে শিক্ষার্থী ফুল দেয়াটাই বুঝে, আর কিছু নয়। ফলে ব্যাপারটি তার কাছে দারুণ মজার বা আনন্দের বলেই ধরা দেয়– শহিদদের আত্মদানসহ অন্তরালের সব কথা অজানাই থেকে যায়। অবশ্য এখন আর শহিদদের স্মরণে পুষ্প অর্পণের প্রথা কোথাও তেমন নেই; বাসা বাড়িতে তো নেই-ই পাড়ায়, এলাকায়, বিদ্যালয়েও নেই। ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাষা আন্দোলন বা একুশ নিয়ে উৎসাহী কখনোই ছিলো না, আজও নয়। বাংলা মাধ্যমের শিক্ষায়তনেও একুশ নিয়ে আগ্রহ প্রত্যাশিত পর্যায়ের নয়। যেটুকু ছিলো আগে, এখন তা ঝিমিয়ে আসছে ক্রমে ক্রমে। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহিদ মিনার নেই (আছে মাত্র অল্প কয়েকটিতে।) নগ্নপদে, ফুল হাতে, 'আমার ভাইয়ের রক্তে'-র সঙ্গীতের প্রভাতফেরি এখন অদৃশ্যপ্রায়। লুপ্তপ্রায় এখন প্রভাতফেরি সম্পর্কে ধারণাও। একুশে ফেব্রুয়ারির ছুটির দিনটি আজকের নগরের শিক্ষার্থীদের অধিকাংশের কাছে ফাস্টফুড, পিকনিক, ওয়ানডারল্যান্ডের ওয়ান্ডারফুল দিন!

আছে লক্ষ্য করার বিষয় আরও। তা হলো ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে বইমেলা। শুরুতে উদ্দেশ্য যাই থাক, বলতে গেলে বাড়িয়ে বলা হবে না যে, বইমেলা এখন লক্ষচ্যুত হয়ে পড়েছে, রূপ নিতে যাচ্ছে এক মহোৎসবে। এ কারও কাছে বাণিজ্যের উপলক্ষ, কারও কাছে গ্রন্থপ্রকাশের। এ কারণেই হয়তো প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে মেলা শেষে মেলার মোট বিক্রিত মূল্য ঘোষণা দেয়ার এবং মেলার মধ্যে নতুন প্রকাশিত গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচনের। ভাগ্যের কী লীলাখেলা, এ ফেব্রুয়ারিতেই আসে কিনা লাল-কমলা-হলুদ বসনা পহেলা ফাল্গুন আর ফুলে ভরা উচ্ছল ডে 'ভ্যালেনটাইন'! যার জমকালো প্রকাশ ঘটানোর জন্য বইমেলাই এখন উপযুক্ত স্থান! এরমধ্যে সাধ্য কি একুশে বা ভাষা আন্দোলন মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়? রিকসা, বাস, স্কুটার, ট্যাক্সি, ক্যাব, কার, সাইকেল, মোটরবাইক সকলের কাছে পথরুদ্ধ ভিড়াক্রান্ত 'ফেব্রুয়ারি'র অর্থ হচ্ছে বইমেলা। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণের বক্তৃতামালা এখন যেন শুধু নীরস নিয়ম-রক্ষা! এ হচ্ছে ঢাকা মহানগরীর কথা। বাদ বাকি বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলোর একুশে ফেব্রুয়ারির কী দশা, তা তো জানা তেমন করেই সম্ভব হয় না।

দুঃখ হয় এ কারণেই যে, যে-'একুশে' আজ পরিণত হতে চলেছে নিয়মসর্বস্ব শুষ্ক এক প্রথায় এবং যার তাৎপর্য মলিন হয়ে যাচ্ছে অনুষ্ঠানের আর আড়ম্বরের অসারতায়, সেই 'একুশে'ই বাংলা ভাষার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বাংলাভাষাকে অপার মহিমা ও অনুপম মর্যাদা এনে দিয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে বাংলা ভাষা কখনোই রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পায়নি, এ তথ্যটুকু পর্যন্ত যেন আজ ঝাপসা হয়ে যেতে বসেছে। অথচ এই স্বীকৃতি আর মর্যাদা পাওয়ার আগে বাংলা ভাষার ভাগ্যে কতো অবহেলাই না জুটেছে খোদ বাঙালিরই কাছে। বাংলা ভাষাকে অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করতে হয়েছে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের বীর বাঙালি সন্তানদের আবির্ভাবের জন্য– যাঁরা বাংলা ভাষাকে ভালোবেসে নিপীড়িত হয়েছেন, লাঞ্ছিত হয়েছেন, শহিদ হয়েছেন, তৈরি করেছেন একটি উজ্জ্বল দিন 'একুশে'– শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা পৃথিবীর জন্য। যুগ যুগ ধরে বিদেশি শাসক ও বিদেশি ভাষার অধীনে থেকে বাংলা ও বাঙালি তাদের জাতিসত্তাকে ভুলেই যাচ্ছিল বলতে গেলে। মধ্যযুগের আদিপর্বে এ দেশ শাসিত হয়েছে সংস্কৃত ভাষায়, মধ্যযুগে সমগ্র মুসলিম আমল জুড়ে ফারসি ভাষায় এবং আধুনিক যুগে ইংরেজ শাসনকালে ইংরেজি ভাষায়। এরপরে পাকিস্তান আমলে এ দেশ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে উর্দু ভাষার আগ্রাসী ভূমিকায়। বাংলা ভাষা প্রীতি সুদূর অতীত অর্থাৎ প্রাচীন যুগ থেকেই বাঙালির জন্য লাঞ্ছনার কারণ হয়েছে নানা সময়ে নানাভাবে। যে সকল হিন্দু সাহিত্যিক দেব-দেবীদের কথা সংস্কৃতি ভাষায় না লিখে বাংলা ভাষায় লিখতেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা রুষ্ট হয়ে তাঁদের অভিসম্পাৎ দিয়েছেন। আর যে সব মুসলমান সাহিত্যিক আল্লাহ, রসুল, রোজা, নামাজের কথা আরবি ফারসিতে না লিখে বাংলায় লিখতেন, কাঠমোল্লারা তাদের স্থান হাবিয়া দোজখে নির্ধারণ করে ফতোয়া দিতেন। অর্থাৎ বাঙালির কাছে বাংলা ছিল দারুণ অবহেলার, এমন কি ঘৃণারও।

এর ফলে বাঙালি মুসলমান সমাজে গজিয়ে ওঠে একটি শ্রেণি যাঁরা নিজেদেরকে 'আশরাফ', খান্দান বলে ঘোষণা দিয়ে বাংলা ভাষাকে হেয় জ্ঞান করতে থাকেন। তাঁদের মতে শরাফতির ভাষা হচ্ছে উর্দু ফারসি এসব, বাংলা ভাষা নওকর শ্রেণির। একই অবস্থা বাঙালি হিন্দুদের মধ্যেও। আভিজাত্যের ভাষা সংস্কৃত; বাংলা ভাষা ইতরজনের, নিম্ন শ্রেণির। এই উভয়গোষ্ঠীই মহাসমারোহে ইংরেজি ভাষাকে লুফে নেন যখন দেশে ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড রূপে দেখা দেয়। এমন সব কারণে ক্ষোভ ও ধিক্কার ঝরে পড়েছে সতেরো শতকের কবি আবদুল হাকিমের কণ্ঠে: 'যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী/সে সব কাহার জন্ম, নির্ণয় ন জানি।' বিশ শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত মাতৃভাষা ছিল বাংলা মুসলমান সমাজে দারুণ বিতর্কের। 'বাঙালি মুসলমানদের ভাষা বাংলা না উর্দু'– এ ছিল তখন পত্র-পত্রিকায় বিতর্কের অন্যতম প্রধান বিষয়।

সুবিধাপ্রাপ্ত এই আশরাফ শ্রেণিটির উন্নাসিকতাই বাংলা ভাষাকে বেশি বিপর্যস্ত করেছে। এরাই উর্দু-বিলাসী সেজে বাংলা বিরোধিতাকে সহায়তা দিয়েছে প্রত্যক্ষভাবে। বলা বাহুল্য, এখন উর্দুর স্থানে এসে যোগ দিয়েছে ইংরেজি, সঙ্গে

হিন্দি। আবার কি তবে সেই মন সেই দিন প্রকট হয়ে উঠতে চাইছে বাংলাদেশে? যদি তাই হয়, তবে তা হবে আমাদের আজকের বিভ্রান্তিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার গুণে। আত্মঘাতীমূলক শিক্ষানীতি এবং শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে বলতে গেলে পুরো বাংলাদেশ এখন ইংরেজির সেবক হয়ে পড়েছে। শহিদ পিতার সন্তানদেরও দেশ ধরে রাখতে পারছে না। প্রভাবশালী ও নেতৃস্থানীয়দের বংশধরেরাও বাংলাদেশে থাকেন না, বাংলা ভাষায় কথা বলেন না– তাঁরা দেশে আসেন আর যান অতিথি পাখির মতো, স্থায়িভাবে বসত গড়েন না।

বললে অত্যুক্তি হবে না যে, আমাদের আজকের বাংলা ভাষার দশা যেন পিছিয়ে গেছে দু'শো বছর আগে- যখন বিত্তবান বাঙালিদের মধ্যে ইংরেজির প্রতি ভালোবাসা এতোটাই প্রগাঢ় ছিল যে, ইংরেজিতে খাওয়া পরা, চিন্তা করা, ঘুমানো, স্বপ্নদেখা তাদের আরাধনায় পরিণত হয়েছিল এবং হয়ে পড়েছিল পরিকল্পনার অংশ। এঁরা সংখ্যায় স্বল্প ছিলেন না। কিন্তু এর পরেও যাকে বলে সিদ্ধি লাভ, তা তাঁরা একতরফাভাবে করতে পারেননি প্রবল প্রতিবাদী বাঙালি সংস্কারদের জন্য। সংস্কারকগণ নিজেদের গুটিয়ে বসে থাকেননি। তাঁরা বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এবং বাংলা ভাষাকে জাগিয়ে তুলেছেন নিজেরা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও। সেই ব্রিটিশ শাসিত বাংলায় স্বাধীনতা আন্দোলন, জনগণের মুক্তিসংগ্রাম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অবলম্বন ছিল বাংলা ভাষা। সমাজসংস্কার আন্দোলন, ধর্মসংক্রান্ত আন্দোলন, সবই হয়েছে সে সময় বাংলা ভাষায়। বাংলা ভাষায় সৃষ্টি হয়েছে নতুন সাহিত্য। বাংলা ভাষা হতে পেরেছে অনেক উন্নত। সেদিনের বাংলা ভাষার অনুরাগী ও ইংরেজ সংস্কৃতির বিরোধীদের প্রেরণা ছিল স্বদেশপ্রেম; তাঁদের মধ্যে ছিল রেনেসাঁসের সুদীপ্ত প্রণোদনা, ছিল নতুন সমাজ ও সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। আজকের স্বাধীন বাংলাদেশে কোথায় সেই নিখাঁদ স্বদেশ চেতনা, কোথায় বাংলা ভাষার জন্য সেই নির্ভীক ভালোবাসা? আজকের বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন শাসকশ্রেণি, অদৃশ্য কলকাঠি হাতের ব্যবসায়ীগোষ্ঠী, উচ্চাভিলাষী ধনাঢ্য মহল, প্রতিপত্তিশালী রাজনীতিবিদ, কেউই বাংলা ভাষার উন্নতি দূরে থাকুক, বাংলা ভাষার অস্তিত্বও টিকিয়ে রাখতে কার্যকর ভূমিকা রাখার কথা ভাবছেন না। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি আমলের মতো বাংলা অনুরাগী, বাঙালি সংস্কৃতি-সেবক, বাঙালি লেখক, বাঙালি চিন্তাবিদ ও সাহসী সত্তা আজকের দিনে খুঁজে পাওয়া যায় না।

বিপর্যস্ত বাংলা ভাষা যে স্থানচ্যুত হতে চলেছে, এমনকি হতে চলেছে সর্বস্বান্ত, এ বোধ কারও নেই। শিক্ষা ও প্রশাসন ব্যবস্থার ভাববিলাস ও ভ্রান্তনীতির কারণে আজ বাংলাদেশ থেকে বাংলা ভাষা বিতাড়িত হওয়ার উপক্রম হয়েছে, এ নির্মম সত্যটুকু পর্যন্ত ধরা দিচ্ছে না কারও কাছে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং উদাসীন– উভয় গোষ্ঠীর কারণেই আজ বাংলা, বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে তরুণ সমাজ নিদারুণ নিস্পৃহ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। এরা বাংলাভাষা বা বাংলার নয়, এমন সব কিছুতেই আকৃষ্ট হচ্ছে।

আশঙ্কা জাগে, এমন অবস্থায় বাংলা মাধ্যমের বিদ্যায় বুঝি শুধু সংকটের মানুষের জন্যই নির্ধারিত হতে যাচ্ছে পাকাপোক্তভাবে। (মধ্যবিত্ত, এমনকি নিম্নমধ্যবিত্তের সন্তানদেরও উল্লম্ফন ঘটছে ইংরেজি মাধ্যমে।) বাংলা মাধ্যম দিতে পারছে না তথাকথিত সপ্রতিভতা, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার ক্ষমতা, মানসম্পন্ন জীবনযাপনের উপযোগী কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা। বিদেশি ভাষার প্রভাব বাংলা মাধ্যমে এখন এমনি কোণঠাসা। ভাষা আন্দোলন কি শুধুই স্মৃতিচারণের ইতিহাস হতে যাচ্ছে তবে? তা-ও একমাত্র ফেব্রুয়ারিতে?

ভাষা আন্দোলন তার পূর্ণ ইতিহাস নিয়ে হারিয়ে যেতে চলেছে আজ তরুণ প্রজন্মের কাছে। তারা উৎসাহিত নয় তাদের মাতৃভাষা সম্পর্কে। তাদের আগ্রহ নেই শেকড়ের সন্ধানে। বিদেশি সংস্কৃতির অপ্রতিরোধ্য প্রভাবে আর সংশ্লিষ্টদের ভ্রান্তদর্শন ও পরাশ্রয়ী নীতির কল্যাণে তারা বিশ্ব-সংস্কৃতির সেবক হয়ে পড়েছে বিশ্বায়নের নামে। দুর্ভাগ্য আমাদের, ভাষা আন্দোলনকে আমরা নিয়ে যেতে পারিনি আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সহজ সরল মানুষের মধ্যে; প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও পরিকল্পনার অভাবে ভাষা আন্দোলন তাঁদের কাছে পৌঁছায়নি তেমন করে। পানিপথের বা পলাশীর যুদ্ধ, কারবালার কাহিনি বা ভাওয়াল রাজার কিসসা যেমন করে জারি বা সারি গানের অথবা পুঁথির মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে গাঁয়ে-গঞ্জের মোয়, হাটে অর্থাৎ দেশের ভেতরের দূরদূরান্তের মানুষের মধ্যে, ভাষা আন্দোলনকে তেমন করে উপস্থাপিত করা হয়নি কোনোদিনই। নৌকাবাইচের উদ্দীপক সঙ্গীত হতে পারতো 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়' বা 'ভুলবো না, ভুলবো না, একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলবো না', 'বরকত সালামের খুনে লাল ঢাকার রাজপথ/ভুলবো না'– এমন সব অবিস্মরণীয় ভাষাসঙ্গীত। বলা চলে, ভাষা আন্দোলন কেবল নামেই বেঁচে আছে শহরে-বন্দরে; এই মহানগরেও বিপুলসংখ্যক মানুষের কাছে– এমন কি সাধারণ শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও। ভাষা আন্দোলন নিয়ে শিশুদের জন্য নাটক বা প্রামাণ্যচিত্র তৈরি হয়েছে কিনা জানা নেই। যতদূর মনে হয়, হয়নি। হলেও তার সংখ্যা অনুল্লেখ্য এবং তা সীমিত পরিসরে আবদ্ধ। ভাষা আন্দোলন নিয়ে যথেষ্ট নয় শিশুতোষ গ্রন্থও। এমন বিস্মৃতিপ্রবণ, নিস্পৃহ ও নির্বোধ পরিবেশে ভাষা আন্দোলন বেঁচে আছে আমাদের পত্র-পত্রিকার মধ্যে। 'একুশ', 'শহিদ মিনার', 'ভাষা আন্দোলন', 'ভাষা সংগ্রাম' সবাই মূর্ত হয়ে ওঠে আমাদের সংবাদ মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে ফেব্রুয়ারি মাসে। ফেব্রুয়ারির পুরো মাস জুড়ে কাগজে কাগজে একুশ যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। এ কারণেই এ তথ্য এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই, 'একুশ' আর 'ভাষা সংগ্রাম'কে বাঁচিয়ে রেখেছে আমাদের সংবাদ মাধ্যম। এ মাধ্যমের মানুষেরাই একে আগলে রেখেছে পরম মমতায়– বর্তমান প্রজন্মকে বাংলামুখী করে তোলার গভীর আশায়। সেই সঙ্গে উত্তরসূরিদের পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বও নিয়ে চলেছেন স্বেচ্ছায়।

ইংরেজি, ইংরেজি-মিশ্রিত আর বিকৃত-বাংলা উচ্চারণের এই বাংলাদেশে অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, বাংলা ভাষা এবং তার বিকাশ ও বিশুদ্ধতা নিয়ে কথা

বলতে গেলে বিপাকে পড়তে হয়। অনাধুনিক ও 'আনকালচার্ড' এবং সংস্কারে আচ্ছন্ন বলে প্রতিপন্ন হওয়ার অবস্থা তৈরি হয়ে যায়। যুক্তি ধরা দেয়, এ বিশ্ব আজ বিচ্ছিন্ন নয় যে, এখানে স্বাতন্ত্র্য স্বকীয়তার দোহাইয়ে বিদেশি ভাষা-প্রীতির মতো আধুনিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া যেতে পারে। এমন ধ্যান-ধারণাতেই আবিষ্ট এখন অধিকাংশ নবীন-প্রবীণের মন। নবোউদ্যমে মাটি ছেড়ে আকাশ ছুঁতে মরিয়া যে নবীন, তার চাওয়া-পাওয়ার অভিলাষে দেশ, মৃত্তিকা, নিজ ভাষার স্থান নেই। নতুনকে বরণের নামে যা কিছু দেশীয়, দেশজ- সে প্রতিহত করতে চায় তাকেই। প্রবীণও এই তথাকথিত সপ্রতিভতার মধ্যেই আধুনিকতাকে খুঁজে পান– যে সপ্রতিভতা তাঁর বা তাঁদের মতে বাংলা ভাষায় নেই। বাংলা ভাষার সার্বিক ব্যবহার ও বিশুদ্ধতা যাঁরা চান, এই গোষ্ঠী তাঁদের দিকে বঙ্কিম দৃষ্টিতে তাকান এবং তাঁদের দৃষ্টিতে শুদ্ধ বাদী বলে কটাক্ষ করেন। বলা বাহুল্য, এই শুদ্ধবাদিতা তাদের রক্ষণশীলতার নামান্তর। সর্বস্তরে মাতৃভাষার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে তাঁরা অতীত-মুখী বলে ধরে নেন। অর্থাৎ তাঁদের সঙ্গে বিভেদটা মোটা দাগের। শুদ্ধবাদীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নেই। ঐ স্থানটি ভাষা নিয়ে বিশৃঙ্খলার আবর্তে যাঁরা, তাঁদেরই।

আশঙ্কা এখন আরও বেশি এ কারণেই।

মাতৃভাষা লালনে মধ্যযুগীয় মানসিকতার প্রতিচ্ছবি যাঁরা দেখতে পান, তাঁরা, বলা যায়, বিদেশি ভাষা-প্রীতির প্রাবল্যে আধুনিকতার সংজ্ঞা গুলিয়ে ফেলেছেন। তাঁদের একপেশে ভ্রান্ত ধারণা ভাষা আন্দোলনের মূল লক্ষ্যে কুঠারাঘাত হানার শামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। মধ্যযুগীয় বলে ভ্রু কুঁচকান যাঁরা, তাঁরা কেন ভুলে যান অন্যান্য ভাষা থেকে শব্দ বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশের উদারতা কেবল আজকের নয়? বর্তমানেও অনেক বিদেশি শব্দ ঠাঁই করে নিয়েছে বাংলা ভাষায়? সকল অতিথি শব্দই তার স্বরূপে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে বাংলা ভাষার সঙ্গে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই। এতে মূলভাষা শ্রীবিবর্জিত হয়েছে বলে চিৎকার তোলেননি তো কেউ। আজকের যতো প্রতিবাদ, সবই বাংলা ভাষার অকারণ বিকৃতি ও অন্য ভাষার অশুভ মিশ্রণের বিরুদ্ধে– যার ফলে বাংলার সংস্কৃতিও পড়তে চলেছে বিপর্যয়ের মুখে।

প্রকৃতপক্ষে ভাবনার কারণ, এই সময়ের ভাষার উচ্ছৃঙ্খল মিশ্রণে– যার আলোচনা হচ্ছে শুরু থেকে। এই মিশ্রণ সহজ কিছু নয়, নয় গ্রহণ প্রক্রিয়ার অনিবার্য অংশ। অনাহুত শব্দের মিশ্রণ হচ্ছে অশুভ পরিবর্তনের সূচক। এ আমাদের ভাষার কাঠামোকেই দুর্বল করে তুলছে, ব্যাহত করছে এর সহজ প্রকাশকে। এ কারণে বিষয়টি বিশেষভাবে বিশ্লেষণের দাবি রাখে। ভাষা মানুষের পরিচয়। আজকের পৃথিবীতে সবচাইতে সমৃদ্ধ দেশগুলোই মাতৃভাষা ব্যবহারে অগ্রসর। ভাষার স্থিতিস্থাপকতার অজুহাতে যদি গ্রহণের পাল্লাই ভারী করে তোলা হয়, তাহলে ভাষার অস্তিত্ব-সংকট দেখা দিতে বাধ্য। বর্তমানে বিশ্বের কোথাও কোথাও ইংরেজি শব্দ ঠেকানোর জোর আন্দোলন চলছে– কোথাও কোথাও আবার বহিরাগত শব্দের আধিক্যে মূল ভাষা পরাস্ত হয়েছে, তৈরি হয়েছে নতুন নামের নতুন শংকর ভাষা।

বাংলাভাষার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। এ ভাষা সারাবিশ্বে পঞ্চম (মতান্তরে ষষ্ঠ) বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। মধ্যযুগের শেষের দিকে, যার ব্যাপ্তি মোটামুটিভাবে চৌদ্দশ থেকে আঠারশ সাল পর্যন্ত, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির নতুন যুগের সূচনা হয় বলা চলে। এ নতুন প্রবাহকে বলা হয়, আধুনিক বাংলা যুগ। চর্যাপদ থেকে শুরু করে বাংলা রেনেসাঁ, আধুনিক ও আধুনিক-পরবর্তী যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। একদা অনাদৃত বাংলা ভাষার সাহিত্য-সংস্কৃতির বিপুল জাগরণের জোয়ার আসে। চর্যাপদ থেকে যদি শুধু বাংলা রেনেসাঁর কাল পর্যন্ত বাংলা ভাষার সংস্কৃতির ঐতিহ্যের কথা ধরা হয়, তা হলে বিনাদ্বিধায় বলা যায়, বাংলা ভাষার অবস্থান পৃথিবীর যে কোনো প্রাচীন সমৃদ্ধ ধনী ভাষা ও সংস্কৃতির সৃজনশীলতার সমকক্ষ। অবশ্য বাংলা ভাষা কখনও রাজভাষা বা রাষ্ট্রভাষা ছিল না। একশ্রেণির পদলেহী বাঙালি বাংলা ভাষার প্রতি বীতরাগ প্রদর্শন করলেও মধ্যযুগীয় অনেক প্রভাবশালী ও সংস্কৃতি-সেবক বিদেশি শাসক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী হয়ে এর উৎকর্ষ সাধনে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদর্শন করেছেন, সম্মানিত করেছেন অনেক বাঙালি প্রতিভাবান, কবি, লেখক, সাহিত্যিককে। কোনো কোনো শাসকের রাজত্বকাল 'বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ' বলেও অভিহিত হয়েছে।

বাংলা ভাষা ও সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতার বিরুদ্ধে প্রথম আক্রমণ আসে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের লক্ষ্মৌ অধিবেশনে। উক্ত অধিবেশনে আলোচিত হয় মুসলমানদের একমাত্র ভাষা করা হবে 'একমাত্র উর্দুকেই' (যদিও প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে বাংলার প্রতিনিধির কণ্ঠে)। এরপরের আঘাত আসে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ-ভারত বিভক্ত হয়ে নতুন রাষ্ট্র 'পাকিস্তান' সৃষ্টি হলে। তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের (পূর্ব বাংলা) অধিবাসী বাঙালি ছিল। সমগ্র পাকিস্তানে বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠ। পাকিস্তানের অপর অংশ পশ্চিম পাকিস্তানের বেশির ভাগ অধিবাসীর ভাষা ছিল পশতু, হিন্দি, পাঞ্জাবি; অর্থাৎ উর্দু নয়। এ সত্ত্বেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা শুধু উর্দুকেই করার তোড়জোড় চলতে থাকে। এর পরের ইতিহাস ভাষা আন্দোলনের আর সংগ্রামের।

আমাদের অনেক আগে, সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে চেকোস্লোভাকিয়ার চেক-রা 'জার্মানাইজেশন'-প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে তাঁদের মাতৃভাষার জন্য লড়েছেন, কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফল তাঁদের জন্য শুভ হওয়ার কারণে তাঁদের আর লড়াই চালিয়ে যেতে হয়নি। এমন আরও অনেক জাতি আছে, যাদের মাতৃভাষা প্রশাসনিক শক্তির দাপটে মিইয়ে বা বদ্ধ হয়ে গেলেও এবং এজন্য তাঁদের মধ্যে ক্ষোভ থাকলেও শক্তির দাপটের সঙ্গে তারা এঁটে ওঠেননি অথবা দৃশ্যত প্রতিবাদী হওয়ার সাহস সঞ্চয় করতে পারেননি। কিন্তু মাতৃভাষার জন্য বাঙালি কোনো অশুভ শক্তিকেই ভয় পায়নি। তারা মাতৃভাষার জন্য রক্ত দিয়েছে এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমেই বাংলা ভাষার বিজয় নিশ্চিত করেছে। সেই সংগ্রামের সিঁড়ি বেয়েই আসা স্বাধীনতার চেতনা আর সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা ভাষা প্রথম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করেছে। পৃথিবীর মধ্যে বাংলাদেশের বাঙালিই একমাত্র

জীবন উৎসর্গকারী ভাষাসংগ্রামী জাতি। তাদের রক্তের বর্ণে সৃষ্ট 'একুশে ফেব্রুয়ারি' মাতৃভাষার অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষের চোখ খুলে দিয়েছে, প্রেরণা যুগিয়েছে মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার। একুশে ফেব্রুয়ারিকে ঘিরে বাঙালি জাতির আবেগ ও যৌক্তিকতা এ দিবসটিকে জাতিসংঘ কর্তৃক 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে'র মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে, এনে দিয়েছে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম দুর্বল জাতিরও 'মাতৃভাষা দিবস' উদযাপনের অধিকার। এর ফলে পৃথিবীর বিকাশমান ও বিলুপ্তপ্রায় সকল মাতৃভাষারই মর্যাদাবোধ ও অধিকার চেতনা সমুন্নত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

এই গৌরবে আত্মতৃপ্ত হয়ে গড্ডলিকা স্রোতে গা ভাসানোর অবকাশ আমাদের নেই। এ কারণেই এ প্রশ্নটি প্রকট হয়ে ওঠে স্বাধীন বাংলাদেশেই এখন মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষা বাংলার এমন বিপর্যয় চলছে কোন সাহসে? ইংরেজি এতো প্রাধান্য পেলো কীভাবে? এমন ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাভাষা অচিরেই তার সৌন্দর্য সৌকর্য হারিয়ে নির্জীব হয়ে পড়বে। স্বাভাবিক গতিশীলতা-হারা হলে এ ভাষার সহজ সুন্দর বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। মুখের ভাষার প্রভাব অবধারিতভাবে পড়বে লেখার ভাষায়। কারণ এমন অবস্থা অনিবার্যভাবে প্রভাব ফেলে ভাষা ব্যবহারকারীর চিন্তায় চেতনায়।

সম্ভব নয়, এমন নিঃস্ব মাতৃভাষা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও।

পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুত্থানে ইংরেজি, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ– এসব দাপুটে ভাষার প্রতাপে অনেক ছোট ছোট উপনিবেশের ভাষা হারিয়ে গেছে। ভাষা হারিয়ে যাওয়ার অনেক কারণই থাকে। যেমনঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগে রাতারাতি পৃথিবীর বুক থেকে কোনো জাতিগোষ্ঠীর বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া, যুদ্ধ-ধ্বংস ইত্যাদি কারণে কোনো জাতির বিলীন হয়ে যাওয়া, অর্থনৈতিক কারণে কোনো জাতির স্থানান্তরিত হয়ে পড়া, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে কোনো ভাষার অবরুদ্ধতা, ভাষাকে শ্রেণি-বিশেষের মধ্যে কুক্ষিগত করে রাখা, অন্য ভাষার জৌলুসে প্রভাবিত হয়ে নিজের ভাষা হেয় জ্ঞান করা। অর্থাৎ ভাষা নিশ্চিহ্ন হওয়ার কারণের মধ্যে অসহায়তা এবং ভ্রান্তি যেমন আছে, তেমন আছে প্রলোভনও। প্রথমটায় দুঃখ থাকে। কিন্তু ধিক্কার জানাতে হয় শেষেরটায়। আত্মবিলোপ অস্তিত্ব বিনাশ করে– ভাষার ক্ষেত্রেও তাই। ভাষার বিলুপ্তির ধরন একাধিক: নিজ ভাষার সর্বস্ব বিকিয়ে অন্য ভাষার দ্বারস্থ হওয়া, অপর ভাষার বর্ণে নিজের ভাষা লেখা, অন্য ভাষার সংমিশ্রণে এবং প্রাধান্যে শংকর ভাষায় পরিণত হওয়া, ভাষা বিলোপের কারণে তার শব্দপুঞ্জ অপর কোনো ভাষায় মিশে গিয়ে সে ভাষা বা ভাষাসমূহের নাম ধারণ করা। এ প্রসঙ্গে ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষা দুটির উল্লেখ করা যেতে পারে– যার মধ্যে প্রথমটি প্রায়-মৃত (অর্থাৎ রূপান্তরিত), বাকিটি মৃত। রোমানদের নিজস্ব ভাষা ল্যাটিন রোমান সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির পরে বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। অবশেষে স্থানীয় উপভাষাগুলোর মধ্য দিয়ে কালক্রমে মিশে যায় ইটালিয়ান, ফরাসি, পর্তুগিজ, স্প্যানিসসহ অপরাপর কয়েকটি ভাষার মধ্যে এবং পরিচিত হতে থাকে ঐসকল

ভাষার নামে। নাম উহ্য থাকলেও সেইসব ভাষায় বিলুপ্ত ল্যাটিনের প্রাধান্য বিদ্যমান। আর সংস্কৃত ভাষা ছিল উচ্চবর্ণের উত্তর ভারতীয়দের ভাষা। এর বিশেষ মর্যাদা ছিল ধর্মীয় ভাষা হিসেবে। ধর্মগুরুদের রক্ষণশীলতার কারণে এ ভাষা কখনোই সাধারণ মানুষের ভাষা হতে পারেনি। বর্তমানেও এটি কারও মুখের ভাষা নয়। অর্থাৎ কালে কালে সংস্কৃত ভাষা মৃত হয়ে যায়। তবে হিন্দি ভাষায় এর প্রভাব আছে এখনও খুব বেশি। এছাড়াও এ ভাষা থেকে প্রচুর শব্দ ঢুকে পড়েছে থাইল্যান্ডসহ পার্শ্ববর্তী অনেক দেশের ভাষার মধ্যে– নিজের নাম বিলুপ্ত করে।

ভাষার প্রবাহ জীবনের মতোই। সঠিক লালন পালন এর প্রসার ও সমৃদ্ধির জন্য যেমন অপরিহার্য, তেমনি এর জীবন রক্ষার জন্য হেলা-ফেলায় একে যেমন খুশি চলতে দেয়া অর্থাৎ বিকৃতি এবং অন্যভাষার আধিক্য ও উচ্চারণকে প্রশ্রয় দেয়া, সর্বোপরি এর মধ্যে আবদ্ধতার সৃষ্টি করে এর গতিশীলতা ব্যাহত করা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কারণ এসবই ভাষার অপমৃত্যু ডেকে আনে। ভাষার বিলুপ্তি সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয় সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর ইতিহাস, হারিয়ে যায় তার সমাজ, মুছে যায় সংস্কৃতি- যার পুনরুজ্জীবন ঘটানো, এককথায় অসম্ভব।

আমাদের আজকের আতঙ্ক এ জায়গাতেও কম নয়।

মাত্রা ছাড়িয়ে যে বিমোহন, তা ধ্বংস আনে। এ ধ্বংস রোধ করার সাধ্য কারও থাকে না। এ কারণে ভারসাম্য বজায় রাখা যেমন জরুরি, তেমনি জরুরি নিজেদের বিশিষ্টতা রক্ষা করাটাও।

প্রসঙ্গত, বাংলা ভাষা নিয়ে প্রবাসীদের অবস্থান বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। আর তা এ কারণে যে, তাঁরা একটি শক্তিশালী অংশ বাংলাদেশের। তাঁদের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিস্তারের ও বিকাশের সুযোগ সবচেয়ে বেশি। সত্য বটে, প্রবাসী বাঙালিদের তৎপরতায় যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দেশে বাংলা বইয়ের দোকানে পাওয়া যাচ্ছে বাংলা বই, প্রকাশিত হচ্ছে বাংলা ভাষার গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা। বাংলায় অনেক সাহিত্য সমাবেশও হয়, তাতে আমন্ত্রিত হন দেশ থেকে অনেক কবি, লেখক, শিল্পীদের মতো গুণীজন। যুক্তরাজ্যে সাপ্তাহিক ও সান্ধ্যকালীনভিত্তিতে বাংলা ভাষার কিছু স্কুল আছে এবং সে সব স্কুলে অনেক বাঙালির সন্তান পড়াশোনাও করছে। বাংলা স্কুল আছে আরব বিশ্বের বেশ কিছু জায়গায়। কাছাকাছির মধ্যে আছে জাপানে। এসব স্কুলে প্রবাসী বাঙালির সন্তানেরা বাংলা শেখার ও পড়ার সুযোগ পাচ্ছে, তবে ভাষাচর্চার সুযোগ বলতে যা বুঝায়, তা নেই। এরপরেও কথা থাকে। এঁরাই সব নন। এঁরা বিশ্বব্যাপী প্রবাসীদের একটি অংশ মাত্র। পশ্চিমা জগতে অন্যত্র, খুব সম্ভবত, বাংলা স্কুল নেই। বিদেশে বিভূঁয়ে পারিবারিক পরিসরে মাতৃভাষাচর্চার গুরুত্ব অধিক এ কারণেই। প্রবাসী বাঙালির গরিষ্ঠ অংশ ব্যক্তিগত পর্যায়ে ও পারিবারিক পরিসরে উত্তরসূরির জন্য বাংলা ব্যবহার ও বাংলা শিক্ষাদানে অনেকটাই উদাসীন, যদিও স্বদেশের প্রতি তাঁদের আনুগত্য ও ভালোবাসা যথোচিত। মাতৃভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে বলে তাঁদের

সন্তানেরা মাতৃভাষা সম্পর্কে পুরোপুরি নিরুৎসাহী। মাতৃভাষার সঙ্গে মিশে থাকে জাতীয় সত্তা, যা মানুষের স্বাতন্ত্র্য স্বকীয়তা অটুট রাখার প্রধান হাতিয়ার। প্রবাসী কৃতী বাঙালিদের কাউকে কাউকে যখন স্বদেশবাসীর উৎফুল্ল অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর উষ্ণ ইংরেজিতে দিতে দেখা যায়, তখন তা দেশবাসীর মধ্যে অনেকেরই উচ্ছ্বাস স্তিমিত করে দেয়। অনেক বাস্তব কারণে নিজের দেশের সঙ্গে প্রবাসীদের নবপ্রজন্মের পরিচয় না থাকতে পারে, কিন্তু তা বলে মাতৃভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও পরাঙ্মুখতা মন মেনে নিতে পারে না। প্রবাসীদের কারণে বাঙালি খাবার এমনকি কিছু কিছু পোশাকও পরিচিত হয়ে পড়েছে বিদেশে। তাহলে বাইরের পরিচিতি দূরে থাক, নিজ ঘরেই মাতৃভাষাকে অপরিচিত রাখার বিষয়টি সঙ্গত বলা যায় কীভাবে? আমাদের প্রতিবেশী দক্ষিণ ভারতীয়দের দিকে তাকানো যেতে পারে। এছাড়াও আছে আরব, চীন, শ্রীলংকাসহ আরও কয়েকটি দেশের প্রবাসী, যাঁরা প্রবাসে নিজ দেশবাসীর সঙ্গে সুসংঘবদ্ধ হয়ে বাস করছেন এবং তৎপর থাকেন নিজেদের ভাষা-সংস্কৃতি নিজেদের মধ্যে সমুন্নত রাখতে। ইংরেজি ভাষার সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হচ্ছে বাংলাদেশ ছাড়া ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, নেপাল- এই সব এলাকায়। এঁরাও প্রবাস জীবনে মাতৃভাষাকে বিসর্জন না দিয়ে নিজেদের মধ্যে পুরুষানক্রমে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকছেন। অবশ্য এর মধ্যে তারতম্য থাকতে পারে। আমাদের বাঙালি প্রবাসীর একটি গরিষ্ঠ অংশ বিদেশে তাঁদের সুদীর্ঘকালের অবস্থানে এবং সুসংঘবদ্ধ জীবনযাপনে মাতৃভাষাকে বংশপরম্পরায় ধরে রেখেছেন সত্য, কিন্তু তা তাঁদের বাংলাদেশীয় আঞ্চলিক ভাষার রূপকেই, বিশুদ্ধ বাংলাকে নয়। তাঁদের ব্যবহারের ভাষা হয় ইংরেজি, নয় আঞ্চলিক বাংলা- ব্যাপারটি এই রকমই। মাতৃভাষার বিশুদ্ধ রূপটাকেও যদি তাঁরা পাশাপাশি চর্চার মধ্যে রাখতেন, তবে তা হতো বাস্তবিকই বাংলা ভাষার প্রসারের জন্য একটি অতি কার্যকর পদক্ষেপ।

এর ফলে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা বাঙালিদের বাঙালিত্বের অস্তিত্ব থাকছে কেবল নামেই। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে 'বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত' পরিচিতিটাও ধুয়ে মুছে যাবে বা যাচ্ছে আপনা থেকেই। এ কারণেই পুরুষানুক্রমিকভাবে দেশ-ছাড়া অবস্থায় মাতৃভাষাকে ভুলে থাকতে থাকতে একেবারে ভুলে যাওয়া এবং বংশধরদের এ ভাষা থেকে দূরে রাখা সুবিবেচনাপ্রসূত বলা যায় না কোনো অর্থেই।

ভাষা হারিয়ে যাওয়ার এও একটি প্রত্যক্ষ কারণ। স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে ভাষার বিলোপ হয়, এ অবশ্যই তার মধ্যে পড়ে না। এখানে বাস্তুহারার নিঃস্বতা বা অসহায়তা নেই, এখানে আছে স্বেচ্ছায় দেশ পরিবর্তনের বিষয়। প্রযুক্তির কল্যাণে আজ বিশ্ব বিচ্ছিন্ন নয় বলে দেশের ভাষা ও কৃষ্টির সঙ্গে সার্বক্ষণিক সংস্পর্শ বজায় রাখা এখন আর অসম্ভব নয়। ইচ্ছা থাকলে সব অসম্ভবই সম্ভব হয়। আসল হচ্ছে মন, মনন ও দৃঢ়তার প্রতিফলন।

বহির্বিশ্ব দূরে থাক, বাংলাদেশেই ভাষা ব্যবহারকারীদের দুর্বলচিত্ততা ও প্রতাপশালী ভাষার প্রতি মুগ্ধতা বাংলাভাষাকে পুনরায় ঠেলে দিচ্ছে তথাকথিত নিম্নশ্রেণির

ভাষায়। পরম বিপর্যয়ের মধ্যেও বাংলা ভাষা বাঙালির সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়ে যে মর্যাদা পেয়েছে একদিন, রাষ্ট্রীয়ভাবে সেই মর্যাদার স্বীকৃতি পেয়েও আজ নিজের লোকের কাছে যেন তার কদর ক্ষীয়মাণ! এজন্যই বলতে হয়, বাংলা ভাষার ভাগ্য বুঝি সুপ্রসন্ন নয়!

ভাষাকে বাঁচাতে পারে একমাত্র ভাষা প্রেমি ভাষা-ব্যবহারকারী মানুষ। ভাষা বিপর্যস্ত হওয়ার উপক্রম হলে ভাষার জনগোষ্ঠীর সচেতনতাই পারে বিনাশের হাত থেকে বাঁচাতে। সঠিক পরিচর্যায় ভাষারও পুনরুজ্জীবন সম্ভব হতে পারে। যেমন হিব্রু ভাষা। নানা কারণে এ ভাষা চলে গিয়েছিল অবলুপ্তির পর্যায়ে। কিন্তু যথাযথ প্রচেষ্টায় উন্নত হয়ে এ আজ ইসরাইলের রাষ্ট্রভাষায় পরিণত হয়েছে। ভাষার যে কোনো আবিলতা ও বিপর্যয় সম্পর্কে সতর্ক থাকা ও সময়োপযোগী সুরাহার জন্য যথাসাধ্য তৎপর হওয়া প্রত্যেকেরই নৈতিক দায়িত্ব।

এ কারণেই প্রত্যেক ভাষায় 'শুদ্ধবাদী' থাকার প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে তাঁদের সংখ্যাধিক্যেরও। একে রক্ষণশীলতা আখ্যা দেওয়া উচিত নয়। ভাষার প্লাস্টিক সার্জারি কোনো অবস্থাতেই প্রশংসনীয় নয়, কাম্যও নয়। ভাষাকে বাঁচাতে হবে তার নিজের মৌলিকতার মহিমায়।

আমরা ইতিহাসের অমোঘ সত্যকে উপেক্ষা করতে পারি না। অতীতেরও না, বর্তমানেরও না। চলমান বিশ্বেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভাষা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে আগামী একশ বছরের মধ্যে আরও অনেক ভাষা লুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। বৃহৎশক্তি ক্ষুদ্রকে ধ্বংস করে, সবল দুর্বলকে বিনাশ করে– পৃথিবীর চিরায়ত এ সত্য প্রযোজ্য ভাষার বেলায়ও।

জেনেশুনেও বিষপান করায় তো অপরাধ হবে যদি আজকের বাংলা ভাষার বিকৃতি, অনুকরণ ও মিশ্রণকে আমরা উদারচিত্তে প্রশ্রয় দিয়ে যাই। এইক্ষেত্রে নমনীয়তার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। অস্তিত্ব-বিপর্যয়ের প্রশ্ন যখন দোরগোড়ায়, রক্ষণশীলতার অপবাদে ক্ষুণ্ন হয়ে অথবা অন্য কোনও কারণে নিষ্ক্রিয় থাকাটা তখন অবশ্যই অন্যায়।

অন্যায় হলেও ঘটছে তাই। বাংলাদেশে বাংলাভাষা চর্চার সুযোগ বা পরিবেশ নেই। অথচ এ তথ্য সত্য ভাষার বিকাশ ও বিকৃতি রোধকল্পে ভাষার নিরন্তর চর্চার বিকল্প নেই। ভাষাচর্চার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে পাঠাভ্যাস। কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, সো-বিজনেস, বিদেশি অনুকরণে বিভিন্ন টিভি অনুষ্ঠানে এসবের প্রভাব কাটিয়ে ওঠার জন্য দরকার পাঠের অভ্যাস। এ অভ্যাস জাগিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজন সমৃদ্ধ পাঠাগার রক্ষণাবেক্ষণ ও সৃষ্টিকরণ। প্রয়োজন, প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশের পরিবেশ প্রস্তুত করা; প্রকাশনা শিল্পকে বিকাশের সব ধরনের সুবিধা দিয়ে একে শিল্প হিসেবে ঘোষণা দেয়া; নিম্ন থেকে উচ্চ পর্যন্ত সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাগারের ওপর প্রাধান্য দেয়া; সেই সঙ্গে সর্বত্র গ্রন্থাগার ব্যবহারের বিস্তার ঘটানোর উদ্যোগ নেয়া। এসব কিছুই হচ্ছে না বলে এবং পূর্বের চেয়ে অবস্থার ক্রমাবনতি

হওয়ার কারণে দেখা যাচ্ছে নবপ্রজন্মের মধ্যে নিদারুণ পাঠ-বিমুখতা। এ পাঠ-বিমুখতায় সংকট সৃষ্টি হচ্ছে চক্রাকারে। যেমন: প্রয়োজনীয় ভালো বইয়ের বিকিকিনি কমে যাচ্ছে; বিক্রির অভাবে প্রকাশক গ্রন্থ প্রকাশে আগ্রহ হারাচ্ছেন; গ্রন্থ বিতানগুলো দেউলিয়া হয়ে কুটিরশিল্প, পোশাক, প্রসাধনী, খাদ্যদ্রব্য, এমনকি পাদুকার দোকানেও পর্যন্ত পরিণত হচ্ছে। সংশ্লিষ্টমহলের উদাসীনতায় এমন করুণ অবস্থা আরও চরম আকার ধারণ করেছে। যেমন: নব নবরূপে নির্মিত ও নির্মাণাধীন এই মহানগরীর প্লাজামল, শপিং কমপ্লেক্সগুলোতে বইয়ের জন্য কোনো জায়গা রাখা হচ্ছে না; বিপুল সংখ্যাধ্যুষিত এই মহানগরীতে এলাকাভিত্তিক 'বুক কর্নারের' ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে না; ফলে কাঙ্ক্ষিত বই কোনও অবস্থাতেই মিলছে না। যেখানে চা, চানাচুর, পান, পানীয়, ফুচকা, চটপটি ঘরের বাইরে প্রায় প্রতি পদক্ষেপে পাওয়া যায়, সেখানে নিত্য নতুন এলাকায় প্রসারিত এবং প্রসারমান ঢাকা মহানগরীর বইয়ের জন্য নির্ভরতা এখনও দক্ষিণ ঢাকার একমাত্র ঐ বাংলা বাজারেই! যে বাজারেরও কিনা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন নেই।

এইসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়। আমাদের বিদ্বজ্জনের একটি সুবিশাল অংশ সাধারণত ইংরেজিতেই লেখেন। পাশাপাশি মাতৃভাষায় লিখলে তা দেশ ও জাতির উপকারে আসার সুযোগ হতো। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় মানসম্পন্ন বাংলা বইয়ের দুর্ভিক্ষ বেজায়। অনুবাদও উল্লেখযোগ্য নয়। বাংলা একাডেমি থেকে উচ্চ পর্যায়ের সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার উদ্যোগ আশানুরূপ নয় এবং প্রকাশিত প্রয়োজনীয় গ্রন্থের পুনমুর্দ্রণও নেই। সব মিলিয়ে শিক্ষার্থী, গবেষক থেকে আরম্ভ করে সব ধরনের উৎসুক পাঠকের জন্য উচ্চশিক্ষার ভালো মানের বাংলায় লেখা এবং বাংলায় অনূদিত গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য। এ বিষয়টি বাংলাভাষার সুষ্ঠু চর্চার অন্যতম প্রধান অন্তরায়। সভ্য দুনিয়ায় জনসংখ্যার সঙ্গে গ্রন্থ প্রকাশনার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের তা নেই। অক্ষরজ্ঞানহীনতা আমাদের বড় একটি সংকট, সন্দেহ নেই। কিন্তু তার চেয়ে বড় সংকট শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রন্থ পাঠে বিমুখতা ও গ্রন্থ ক্রয়ে অনীহা। অবশ্য এ জন্য গ্রন্থ সহজলভ্য না হওয়া এবং বিশেষভাবে গ্রন্থ-বাছাইয়ের সুযোগের জন্য কাছাকাছি গ্রন্থ-বিতান না-পাওয়াও যে অন্যতম কারণ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

যতো যাই হোক এ তথ্য সত্য, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি সার্বিকভাবে বাংলাদেশের বাঙালির আবেগ ও শ্রদ্ধা অপরিসীম। তবে অস্বীকারের উপায় নেই, আমাদের দুর্ভাগ্য বহুবিধ। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে দারিদ্র্য। দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বিপুল। দারিদ্র্যসীমার নিচে যাঁরা, তাঁদের কাছে ভাষা-জ্ঞান বা পরিশীলন প্রত্যাশা নিদারুণ উপহাসের মতো। দ্বিতীয় পর্যায়ে, জনগোষ্ঠীর এক বিশাল অংশ অক্ষর জ্ঞানহীন। নানা ধরনের পরিসংখ্যানে স্বাক্ষর বলে যাঁদের ঘোষণা দেয়া হয়, তাঁদেরও বেশি অংশের জ্ঞান শুধু নিজের নামের স্বাক্ষরদান পর্যন্ত, এর বেশি নয়। তাঁদের ভাষা মার্জিতকরণ বা তাঁদের মধ্যে ভাষা-চিন্তার বিষয়টি প্রত্যাশা করা অকল্পনীয়। তৃতীয়ত, যাঁরা আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁদের শিক্ষার মান প্রশ্নাতীত পর্যায়ের

নয়। এমন ক্ষেত্রেও ভাষার নৈরাজ্য কাটানোর প্রয়াস অবান্তর। এর পরে যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে শিক্ষার বিভাজন আছে, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিভাজন তাঁদের বিভক্ত করে রেখেছে। এমন বিভক্তি অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতা এখন পরিবারের মধ্যেও। এই বৈষম্য আর বিভাজন নিয়ে সম্মিলিতভাবে বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির ব্যাপারটি বাস্তব কারণেই অসাধ্য হয়ে পড়েছে। এরপর অবশিষ্ট সুপুষ্ট সুরুচিসম্পন্ন সুন্দর ভাষার অধিকারী যাঁরা, তাঁদের বাংলা ভাষা নিয়ে শিরঃপীড়া নেই। উচ্চাভিলাষ, অর্থোপার্জন, সম্পদ-আহরণ, যশখ্যাতির আকর্ষণ, বিদেশ-বন্দনা তাঁদের এতো বেশি বেসামাল করে রাখে যে, তাঁদের দ্বারাই উল্টো ভাষার চেহারা পাল্টে যাচ্ছে। তাহলে আমাদের নির্ভরতা কার কাছে? কার কাছেই বা প্রত্যাশা? প্রতিকার প্রার্থনা? ভাবতে হবে।

বাংলাদেশ বাংলা ভাষার দেশ। বাংলাদেশ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দেশ। এখানে আটানব্বই শতাংশেরও বেশি অধিবাসী বাঙালি। বাঙালি আছে ভারতের তিনটি রাজ্যে– পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামে। এছাড়া আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রবাসী বাঙালি বিশ্বজুড়ে। ভারতে বাঙালিদের বাংলা ভাষার জন্য মরণপণ সংগ্রাম নেই। বাঙালি সম্প্রদায়ের একটি অংশ যে প্রবাসী বাঙালি, তাঁদের উত্তরসূরিরা বাংলাভাষা থেকে দূরে থাকার সুযোগ পাচ্ছে। এই অবস্থায় বাংলা ভাষার ভরসা এখন বাংলাদেশের বাঙালিই। এঁদের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে বাংলা ভাষার জন্য আত্মত্যাগের এবং বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার; সেই সঙ্গে রক্তক্ষয়ী অত্যুজ্জ্বল দিন 'একুশে ফেব্রুয়ারি'কে আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বের সর্বত্র পৌঁছে দিয়ে বাংলা ভাষার জন্য অভূতপূর্ব মর্যাদা অর্জনের। এ কারণেই আশা করতে হয় তাঁদের নিয়ে।

আশা, তাঁরা তাঁদের স্বদেশের সকল বাঙালির মুখে পরিশীলিত বাংলা ভাষা ফোটাবেন, বাংলা ভাষার বিকৃতি-প্রবণতা ঘোচাবেন, বাংলা ভাষার সম্ভার দিনে দিনে আরও সমৃদ্ধ করে তুলবেন। আর বিশ্বে বাংলা ভাষার নেতৃত্ব নিয়ে তাঁরা (বাংলাদেশের বাঙালিরা) বাংলা ভাষার গৌরব অধিকতর বৃদ্ধি করবেন। ইতিহাসে এই বাঙালিকে কম কোণঠাসা হতে হয়নি। একসময় তাঁরা নিজ ভূমিতেই ছিলেন হীন, চক্ষুশূল ছিলেন অবাঙালি শাসক শ্রেণির। ফলে চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে থেকে থেকে তাঁদের অনেক পিছিয়ে যেতে হয়েছে। এখন তাঁরা মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর মর্যাদা পেয়েছেন। এ মর্যাদা কারও দান নয়– অর্জন। এ অর্জন অর্জিত হয়েছে তাঁদের সন্তানের দ্বারাই। কাজেই বাংলা ভাষার বর্তমান বিপর্যয়ের এই দিনে এখনও যদি তাঁদের ঘোর না কাটে, তবে তাঁদের পরবর্তী দুর্ভাগ্যের দায়ভার বর্তাবে তাঁদের ওপরই।

এ প্রেক্ষিতে আজ নিজেদের ভাষার বিপর্যয় সম্পর্কে সতর্ক বিশ্লেষণের দরকার আছে। অবশ্যই নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। কেননা অঙ্গীকার ও দৃঢ়তার কাছে কিছুই যে অসম্ভব নয়, তার প্রমাণ অতীতে পাওয়া গেছে। এখন প্রয়োজন সঠিক দিকনির্ণয় ও অনড় চিত্তে সমস্যার সমাধান। অন্য কোনও ভাষার প্রতি অ-শ্রদ্ধা ও ঘৃণা

আমাদের নেই। আমাদের শ্রদ্ধা আমাদের আত্মবিশ্বাসের প্রতি, আমাদের ভালোবাসা আমাদের মাতৃভাষার প্রতি। আমাদের ভাষা সুন্দর, শ্রুতিমধুর। বিদেশিদের মধ্যেও এ ভাষার মাধুর্যের বিপুল স্বীকৃতি বিদ্যমান। একে বিনষ্ট করা থেকে রক্ষা অর্থাৎ একে সব ধরনের বিকৃতি ও অবাধ মিশ্রণের বিপর্যয় থেকে বাঁচানো আমাদের প্রাথমিক দায়। এর পরেই আবশ্যক এর পরিচর্চা ও উন্নয়ন। মাতৃভাষার ওপর আমাদের অনন্ত অধিকার। এ অধিকার হচ্ছে ভাষার সংরক্ষণ, বিকাশ সাধন ও সমৃদ্ধিকরণের– আধুনিকতার অপনামে নির্বিচার হঠকারিতায় ভাষাকে বিকলাঙ্গ করা নয়, নিঃশেষ করাও নয়।

মানুষের জীবনে প্রবল পরিবর্তন ঘটেছে দুটো বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পৃথিবীতে– জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তাচেতনার বিশাল প্রসারে। বিশ্বায়ন এসেছে অবধারিতভাবে। এ কারণে বিশ্বায়নও আজ বাস্তবতা মাতৃভাষার সঙ্গে। একটিকে পরিহার বা উপেক্ষা করার উপায় আমাদের নেই। এখানে আসল হচ্ছে যার যা বিশিষ্টতা, তার প্রতি শ্রদ্ধা রাখাটাই। সমৃদ্ধ মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণের বিকল্প যেমন নেই, তেমনি অন্য ভাষার প্রতি বীতশ্রদ্ধা প্রদর্শনেরও অবকাশ নেই। ভাষা আমাদের প্রাণ। একে ছাড়া আমরা অস্তিত্বহারা হয়ে যাই।

ভাষা আমাদের সম্পদ। একে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব আমাদের। আমাদের মনে ধরে রাখতেই হবে– পৃথিবীতে যখন যেখানে অন্য ভাষার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হয়েছে স্থানীয় ভাষা বা ভাষাগুলোর জীবনের বিনিময়ে। এ জন্য সতর্কতার প্রয়োজন আছে। অত্যাধুনিকতার নামে ভাষা নিয়ে আমাদের কিছু নব্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাচার শক্তহাতে বন্ধ করতে হবে। আকাশসংস্কৃতির বল্গাহীন প্ররোচনা কঠোরভাবে রুখতে হবে। ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে শিশু-কিশোরদের আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির জগতে ফিরিয়ে আনতে হবে। পশ্চিমা ভাষা-সংস্কৃতি ও রীতিনীতিতে আকৃষ্ট ও আসক্ত যুব সমাজকে স্বদেশপ্রেমে আর নিজস্ব সংস্কৃতিতে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। বাংলা ভাষার চর্চার অবাধ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। উন্নতমানের গ্রন্থ প্রকাশ থেকে আরম্ভ করে এলাকা ভিত্তিক মানসম্পন্ন গ্রন্থ বিপণনকেন্দ্র গড়ে তুলতে যত্নবান হতে হবে। কৌতুকের নামে ভাষাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার প্রবণতাকে প্রবলভাবে নিরুৎসাহিত করতে হবে। ভাষা নিয়ে সামান্যতম বিচ্যুতি, বিভ্রম ও বিলাসকে হালকা চালে উড়িয়ে দেয়া যে মারাত্মক পরিণামবহ, তা সচেতন সম্প্রদায়কে অনুধাবন করতে হবে। আরও অনুধাবন করতে হবে, বাংলাদেশে বাংলাভাষারই অগ্রাধিকার থাকবে, অন্য ভাষা আসবে তার পরে।

একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, আমাদের ভাষার ইতিহাসে ভীরুতার ঠাঁই নেই। ভাষাকে ভালোবেসে তার জন্য শহিদ হয়েছেন আমাদেরই পূর্বসূরি, এবার সে ভাষাকে পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছানোর দায় আমাদেরই। আমাদের রক্তাক্ত তারিখ 'একুশে' অত্যুজ্জ্বল হতে পেরেছে পৃথিবীর দিনপঞ্জিতে, এবার 'একুশের' ভাষা যে বাংলা, তাকে পরিচিত করতে হবে বিশ্বের দরবারে। বাংলা ভাষার সুবাদে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের' মর্যাদা যখন অর্জিত হয়েছে, তখন বাংলা ভাষা

জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষায় পরিণত হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে– এমন প্রত্যয় জাগে।

হ্যাঁ, বাংলাদেশের 'একুশ' তুলে ধরবে তার বাংলা ভাষাকে, এই প্রত্যাশা আমাদের। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের আকাঙ্ক্ষা বাংলা ভাষার নেতৃত্ব দানের। এই লক্ষ্যে আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে সব ধরনের বিকৃতি ও মিশ্রণ বিবর্জিত করে অনাবিল রূপ দিতে হবে, ফিরিয়ে আনতে হবে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে, সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে নব নব কলেবরে।

অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি, রাষ্ট্রীয় প্রভাব, রাজনৈতিক প্রতাপ ছাড়াও ভাষা যে সমুন্নত হতে পারে তার স্বকীয় মহিমায়, এ সত্যটাই আমাদেরকে আজ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে বিশ্বের কাছে। প্রয়োজন হলে এ লক্ষ্যে আরও একটি ভাষা আন্দোলন করতে হবে। আগের ভাষা আন্দোলন ছিল ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার, আজকের ভাষা আন্দোলন হবে ভাষার মর্যাদা রক্ষার। এ আন্দোলন হবে আমাদের বিকৃতির বিরুদ্ধে বিশুদ্ধির, আমাদের আত্ম-বিনাশের বিরুদ্ধে আত্ম-বিকাশের। অর্থাৎ এ আন্দোলন হবে আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের– এ আন্দোলন হবে আমাদের অন্তর জয়ের।

সর্বস্তরে বাংলা ভাষা: শুদ্ধ বানানে শুদ্ধ উচ্চারণে

অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান

চারদিকে তাকিয়ে যা দেখি, তা থেকে কিছু না কিছু শিখি। একবিংশ শতাব্দী জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে বাংলাদেশের শহর-বন্দর-গ্রাম-গঞ্জ সর্বত্র অসংখ্য সাইনবোর্ড, ব্যানার, পোস্টার চোখে পড়ে। রঙ-বেরঙের ব্যানার পোস্টার নানারকম ভুল বানানে জর্জরিত। বাইরে চাকচিক্য, অথচ শব্দগুলো বানান ভুলে দৃষ্টিকটু। প্রত্যন্ত পল্লীতেও সাইনবোর্ড ঝুলছে। 'দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন' 'দারিদ্র্য' বিমোচনে এই প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু বানানটিতে যে দারিদ্র্য, যে বিভ্রান্তি রয়েছে সে সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সচেতনতার 'দারিদ্র্য' লক্ষণীয়। রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ডে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক ব্যবহারের জন্য প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ঘোষণা করেছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের মূল

সংবিধানের ৩নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা'। সরকারি কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। ইউনেস্কোর এই স্বীকৃতি লাভের পর ২০০০ খ্রিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি ইউনেস্কো মহাসচিব কোইচিরো মাতসুয়ারা বিশ্বের ১৮৮টি দেশের কাছে চিঠি দিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসটি পালনের আহ্বান জানান।

বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে আমরা পেলাম প্রিয় বর্ণমালা; প্রিয় মাতৃভাষা বাংলার জন্য আজ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতি পাচ্ছি। কিন্তু সেই ভাষার বর্ণ, শব্দ, বাক্য নানাভাবে ভুল উচ্চারণ কিংবা লেখার ক্ষেত্রেও বিকৃত হচ্ছে নানাভাবে।

বাংলাদেশের সাইনবোর্ড ব্যানার পোস্টারে যে সব ভুল বানান প্রতিদিন চোখে পড়ে, সেই সাইনবোর্ডগুলো আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

নগরীর বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠেছে কোচিং সেন্টার । শিক্ষা সহায়ক এই প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষাবিস্তারে যে ভূমিকা রাখছে, তা প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু ব্যানারে যখন দেখা যায় '২০০৮ খ্রিস্টাব্দে এস. এস. সি পরীক্ষার ফলাফল ভালো' - বাক্যটির ভ্রান্তি বোদ্ধা পাঠকের নিকট পীড়াদায়ক এ জন্য যে, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে এস. এস. সি পরীক্ষার ফল ভালো, এতে আমরাও আনন্দিত কিন্তু "ফলাফল ভালো" বাক্যটিকে ভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিয়েছে, ফল ভালো হোক অফলকে দূরে ঠেলে- এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

নগরীর প্রাণকেন্দ্র থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত পল্লীতে ঔষধ বিক্রির জন্য রয়েছে ফার্মেসি, যা সাধারণ মানুষের কল্যাণে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে; কিন্তু 'মেডিসিন কর্ণার' 'ভূপতি ফার্ম্মেসী' এই বানানগুলো ঔষধ বিক্রেতা ও ক্রেতাকে ভাবিয়ে না তুললেও বাংলা ভাষার শুভাকাঙ্ক্ষীদের কষ্ট লাগাটা স্বাভাবিক। তাই 'মেডিসিন কর্নার' ও ভূপতি ফার্মেসি' যথার্থ বানানেই লেখা উচিত।

ঢাকা শহরে নীলক্ষেত নিউমার্কেট থেকে শুরু করে দেশের প্রতিটি জেলা শহরের মার্কেটে কিংবা অফিস-আদালতে রয়েছে ফটোকপি মেশিন। রং-বেরঙের সাইনবোর্ডে শোভা পাচ্ছে লেখাগুলো- 'দোলা ফটোষ্ট্যাট', 'দীপ ফটোষ্ট্যাট'। কিংবা 'এখানে ভালো মেশিনে ফটোষ্ট্যাট করা হয়। মেশিন ভালো, 'ফটোস্ট্যাট' ভাল- এটা অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু নিরানন্দের ব্যাপার হচ্ছে 'ফটোস্ট্যাট' বানানটি ভুল। যা শিক্ষার্থীদের ভুল বানানের দিকে ঠেলে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত।

ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্রে সুউচ্চ বহু প্রাসাদ শোভা পাচ্ছে। আকাশছোঁয়া স্বপ্নের মতো উঁচু উঁচু ভবনগুলোতে কার না বসবাস করতে ইচ্ছে করে। ইষ্টার্ণ প্লাজা, ইষ্টার্ণ ভ্যালী, ইষ্টার্ণ মল্লিকা, ইষ্টার্ণ পয়েন্ট বসবাসের জন্য চমৎকার এ্যাপার্টমেন্ট তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু সন্দেহটা বানানে। এই ভুল বানান প্রতিদিন চোখে পড়ে,

এ্যাপার্টমেন্টে বসবাসরত ব্যক্তিদের, কখনো বা চোখে পড়ে পথিকের। ব্যস্ত নগরী ঢাকায় কারো থামার সময় নেই, সময় নেই ভুল বানানটির কথা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানানোর। এভাবেই ভুল সাইনবোর্ড শোভা পায় নগরীর সুরম্য অট্টালিকায়। ভুল বানানগুলো দিনে যেমন চোখে পড়ে, রাতেও সোডিয়াম আলোয় বিকৃত হাসি হাসে। মহাখালী হতে হযরত শাহজালাল (র.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যেতে কী চমৎকার নয়নাভিরাম দৃশ্য রাস্তার দু'ধারে! বিমানবন্দরের কাছাকাছি গেলে আরো মুগ্ধ হতে হয় চমৎকার পরিবেশ দেখে। বিমানবন্দরের প্রবেশ-দ্বারের দক্ষিণেই চমৎকার সাইনবোর্ড 'বলাকা' বাংলাদেশ বিমান প্রধান কার্য্যালয়'। সোনালি হরফে জ্বলজ্বল করছে প্রতিটি শব্দ, সোনালি স্বপ্নের মতোই সাইনবোর্ড। কিন্তু দুঃখ হয়, কর্তৃপক্ষের অসচেতনতার কারণেই ভুল বানানে 'কার্য্যালয়' বছরের পর বছর রয়ে যায়। নবীন-প্রবীণ সকলের চোখেই ভ্রান্তির কালোছায়া পড়ে প্রতিদিন। বাংলামটর ছাড়িয়ে শাহবাগ এলেই 'চাঁন' মসজিদ, রোকেয়া সরণিতে 'লালচাঁন মসজিদ' চোখে পড়ে পথিকের। মসজিদ প্রার্থনার পবিত্র স্থান, কিন্তু বানানটিকে অপবিত্র করা হয়েছে 'চান'কে চাঁন করে। 'চাঁদ' হলে চন্দ্রবিন্দু শোভা পেত- খাঁ-তে যেমন পায়, গাঁ-তে যেমন হয়। 'খাঁন' চাঁন' লিখে যারা বানান ভ্রান্তি ঘটায়, পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে তারা বানানে ভ্রান্তির বিষ-বাস্প ছড়ায়। ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণে 'ষ 'স্থলে 'স' হতেই হবে। দেশের সর্বত্রই স্টাফবাসগুলোর সাইনবোর্ড সংশোধন অত্যাবশ্যক। 'ঢাকা বোর্ড ষ্টাফ কোয়ার্টার' ভ্রান্তির অতলেই তলিয়ে আছে, রক্ষা করার দায়িত্ব সচেতন নাগরিকেরই। নগরীর প্রাণকেন্দ্রে আলোয় ঝলমল করছে 'অঞ্জলী জুয়েলার্স'। 'অঞ্জলী জুয়েলার্সে' সোনা খাঁটি হতে পারে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু খাঁটি নয় শুধু বানানটি। 'অঞ্জলীকে' শুদ্ধ করার দায়িত্ব 'অঞ্জলি জুয়েলার্সে'র মালিকের। শুদ্ধতার জন্য অনুরোধ করবে বাংলা ভাষার, তার অপেক্ষায় প্রহর গুণছে পরবর্তী প্রজন্ম। অঞ্জলি বানান জানলে 'গীতাঞ্জলী' 'শ্রদ্ধাঞ্জলী' এসব ভুল বানানে সাইনবোর্ড, ব্যানার পোস্টার শোভা পেতো না।

প্রত্যূষে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে পুষ্প হাতে যারা শহিদ মিনারে আসে তাদের ব্যানারে 'শ্রদ্ধাঞ্জলী' লেখা থাকলে ভাষা শহিদদের আত্মা কষ্ট পায়। ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় প্রবেশ করলেই চোখে পড়ে 'হর্ণ বাজানো নিষেধ', এরূপ সাইনবোর্ড বহু প্রতিষ্ঠানের সামনেই শোভা পায়। নিষিদ্ধ হোক 'হর্ণ বাজানো' তাতে কোনো আপত্তি নেই; কিন্তু আপত্তিটা 'হর্ন' বানানে 'ণ' প্রয়োগে। যেমন ভুল প্রয়োগ হয় 'কর্ণেল' শব্দটিতে। কোন পথিক একটু দাঁড়িয়ে বলবে কর্তৃপক্ষের কানে কানে 'হর্ণ' বানানে শুদ্ধরূপ 'হর্ন' হবে এবং 'কর্ণেল' হবে কর্নেল– সেই প্রত্যাশায় আছে পরবর্তী প্রজন্ম। 'জর্দা ছাড়া পান, তবলা ছাড়া গান' ভালো লাগে না– কথাটি বাংলা প্রবাদে প্রচলিত। পানে যারা জর্দা খায় নিষেধ করলেও তারা খাবেই, এটা তাদের নেশা, কিন্তু এভাবে 'জর্দ্দা' বানানটি লিখে যাদের নেশা হয়েছে, সে নেশা দূর না হলে পরবর্তী প্রজন্মকেও ভুল বানানের দিকে ঠেলে দেয়া হবে, তা মোটেই সমীচীন হবে নয়। 'বাবা জর্দ্দা' হোক আর 'রতন জর্দ্দা' হোক বানানটি শুদ্ধতার স্বচ্ছ সলিলে স্নান করিয়ে 'জর্দায়' পরিণত করতে হবে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজলা গেটে প্রবেশদ্বারের পশ্চিম প্রান্তে 'ইকরা প্রিন্টিং প্রেস' আর তেজগাঁ 'গভর্ণমেণ্ট প্রিন্টিং প্রেস' ভুল বানানে লেখা, বিদেশি শব্দে 'ণ' হবে না। ণ-ত্ব বিধানের এই শাশ্বত নিয়মটি প্রয়োগ হয় না। বাংলাদেশের অধিকাংশ সাইনবোর্ডে 'ণ' 'ন' এর অপপ্রয়োগ হচ্ছে সর্বত্র। দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ডগুলো প্রতিনিয়ত চোখে পড়ে কত না পথিকের, নবীন শিক্ষার্থীরা এই সাইনবোর্ড দেখে ভুল বানান শেখে প্রতিদিন।

'বহুমুখী' উচ্চ বিদ্যালয়' বহু রয়েছে বাংলাদেশে। কিন্তু সমস্যাটা যখন মুখী 'মূখী' হয়। 'ফারহানা সম্পা বহুমূখী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়'। বহুমুখী এই উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষার মান ভালো, কিন্তু বহুমূখী বানানটি শুদ্ধরূপ 'বহুমুখী' হওয়া উচিত। মডার্ন পরিবহন কাউন্টারে গিয়ে 'মডার্ণ' বানান দেখে বিস্মিত হই, আবার কোথাও বিস্ময়ের সীমা থাকে না, যখন দেখি 'মর্ডাণ পরিবহণ'। আসুন, আমরা জনসচেতনতা সৃষ্টি করি। ভুল বানানে লিখিত সাইনবোর্ড অপসারণ করে অতিদ্রুত শুদ্ধ সাইনবোর্ড লাগাতে হবে, এক্ষেত্রে বাংলা একাডেমিকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। ভুল সাইনবোর্ডধারী প্রতিষ্ঠানকে শুদ্ধতার সুযোগ দিয়ে নোটিস দিতে হবে। প্রয়োজনে আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে হস্তক্ষেপ করতে হবে।

নোটিস প্রাপ্তির পর শুদ্ধ না করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভাষাকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করা দেশের সর্বস্তরের মানুষের দায়িত্ব।

বানান ভ্রান্তি নিরসনে পদক্ষেপসমূহ:

১। প্রশাসনের সতর্ক দৃষ্টি ২। জনসচেতনতা সৃষ্টি করা ৩। শিক্ষক -শিক্ষার্থীদের মাঝে বানান বিষয়ক সেমিনার আয়োজন করা। ৪। সাইনবোর্ড, ব্যানার, পোস্টার লিখনশিল্পীদের বানান বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। ৫। সকলের মাঝে বাংলা ভাষার প্রতি প্রগাঢ় প্রেম সৃষ্টি করা।

বাংলা ভাষার শুদ্ধতা রক্ষা করতে হবে

সালাহ্উদ্দিন নাগরী

বাংলা আমাদের রাষ্ট্রভাষা এবং একইসঙ্গে দাপ্তরিক ভাষা। সব সরকারি অফিস ও কর্মপ্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষায় কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে। আমরা বাংলায় কথা বলি। রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিবছর ফেব্রুয়ারিতে মাসব্যাপী বইমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ভাষা আন্দোলনের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্বব্যাপী ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়ে আসছে। জাতীয় পর্যায়ে অনন্য অবদানের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্য থেকে একুশে পদক প্রদান করা হচ্ছে। বাংলা ভাষার উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমি কাজ করে যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলা ভাষাকে যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, আমরা ব্যক্তি পর্যায়ে বাংলার প্রতি কি ততটুকু শ্রদ্ধাশীল? বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের দায়দায়িত্ব কি যথাযথভাবে পালন করছি?

আমাদের প্রতিদিনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা কি লোকদেখানো? ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন কি একটি মাস, একটি দিন বা বিশেষ কিছু অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক? ব্যক্তি, পরিবার, সামাজিক পর্যায়ে ও কর্মক্ষেত্রে দৈনন্দিন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বাংলা ভাষার প্রতি অনেক ক্ষেত্রে যথাযোগ্য সম্মান, শ্রদ্ধা-ভালোবাসা তো প্রকাশ পায়ই না, কোনো কোনো সময় অবজ্ঞার ভাবই ফুটে ওঠে।

ভুল বানান, উচ্চারণ ও ইংরেজি ঢঙে বাংলা লেখা ও বলাটা অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। প্রাইভেট রেডিও চ্যানেলগুলোয় ইংরেজি-বাংলা মেশানো উদ্ভট উচ্চারণের বাক্যালাপে আতঙ্কিত না হয়ে উপায় থাকে না। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থাপকসহ অংশগ্রহণকারীরা 'গ্রেট', 'গুড মর্নিং', 'গুড ইভিনিং', 'গুড নাইট' ও 'বা-বাই' বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন। দশজনের কাছে নিজেকে স্মার্ট হিসাবে তুলে ধরার জন্য খুব সচেতনতার সঙ্গে বাংলার বদলে যতটুকু পারছেন ইংরেজি বলার কসরত করে যাচ্ছেন। মনে হচ্ছে, বাংলা ভাষা তাদের কাছে অপাঙক্তেয় হয়ে যাচ্ছে।

এ বিষয়গুলো চিন্তা করেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবাইকে, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে বাংলা শব্দের বানান ও উচ্চারণ সম্পর্কে আরও সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন বহুদিন আগেই। তিনি আরও বলেছিলেন, ইদানীং বাংলা বলতে গিয়ে ইংরেজি বলার একটি বিচিত্র প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। জানি না, অনেক ছেলেমেয়ের মাঝে এখন হয়তো এটি সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে গেছে। এভাবে কথা না বললে যেন তাদের মর্যাদাই থাকে না, এমন একটা ভাব।

কোনো ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশের অন্যতম উপায় হলো শুদ্ধ বানান ও উচ্চারণে কথা বলা ও লেখা। শুদ্ধ-অশুদ্ধ যা-ই হোক, আমরা ইংরেজি লেখার সময় অনেক সতর্ক থাকি, পাছে যোগ্যতা ও স্মার্টনেস যদি ক্ষুন্ন হয়! কিন্তু ভুল বানানে বাংলা লেখায় কারও দক্ষতা, যোগ্যতা নিয়ে সাধারণত কোনো প্রশ্ন তোলা হয় না। আর সেজন্য আমরা অশুদ্ধ উচ্চারণ ও বানানে বাংলা বলছি, লিখছি ও পড়ছি। কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই, শোধরানোর তাগিদ নেই, গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে একই ভুলের চর্বিত চর্বণ করেই চলেছি।

বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের স্ক্রল ও ফেসবুক পোস্টের দিকে তাকালে বোঝা যায় কত অযত্ন, অবহেলা ও অজ্ঞতার সঙ্গে শব্দ ও বাক্যগুলো লেখা হচ্ছে। যারা এসব করছেন, তারা কিন্তু উচ্চশিক্ষিত এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। অল্প বয়সের শিক্ষার্থী এবং আমাদের মধ্যে যারা সরাসরি লেখাপড়ার সঙ্গে যুক্ত নয়, তারা যখন টিভি চ্যানেলে কোনো লেখা দেখে, পত্র-পত্রিকা পড়ে, তখন ওখানে যেভাবে লেখা থাকে সেটাকে সঠিক মনে করে। ওইসব ব্যক্তির জ্ঞান-গরিমার প্রতি সাধারণের বিশ্বাস এতটাই সুদৃঢ় যে, তারা ভুল বানানে কিছু লিখতে পারেন এমনটি কখনোই ভাবতে পারেন না।

প্রতিনিয়ত ভুলগুলো দেখে আমার মনে হয়েছে, আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি 'র' ও 'ড়'-এর উচ্চারণে পার্থক্য বুঝতে পারছেন না। তাই 'পাড়'-এর বদলে লিখছেন 'পার' এবং 'শাড়ি'র বদলে 'শারি', 'জুয়াড়ি'র বদলে 'জুয়ারি'। 'সারি' 'সারি' গাছ, 'উজাড়' করা ভালোবাসা হয়ে যাচ্ছে যথাক্রমে 'শাড়ী' 'শাড়ী' গাছ, 'উজার' করা ভালোবাসা, লেখা-'পড়া' হয়ে যাচ্ছে লেখা-'পরা'।

এখন কথা হলো, আমরা কি আসলে এগুলোর শুদ্ধ বানান জানি না? যারা এ ধরনের ভুল নিয়মিত করে যাচ্ছেন, তাদের ভাষাজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তোলাটা খুবই যৌক্তিক। একই ভুল পুনঃপুন যদি হতেই থাকে, তবে এটাকে অজ্ঞতা হিসাবেই ধরে নিতে হবে। এ ধরনের ভুল চর্চাই একদিন হয়তো সঠিক বলে বিবেচিত হতে থাকবে। কারণ, দশজন যা লিখবেন, বলবেন, পড়বেন, সেটাই সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। প্রতিনিয়ত ভুলের সমষ্টি যদি পাহাড়সম হয়ে যায়, তাহলে সবাই মিলে চেষ্টা করেও সে ভুলগুলোকে সহজে সারানো যাবে না।

আরেকটি বিষয় এখানে আলোচনার দাবি রাখে। একই শব্দ বিভিন্নজন বিভিন্ন বানানে লিখে থাকেন। বাংলা বানানে সমতা আনয়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর আরও সমন্বয় জরুরি হয়ে পড়েছে। তাই এখনই সতর্ক হতে হবে, নইলে আমাদের ভাষা প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত হতেই থাকবে। একুশের চেতনায় আমাদের শুদ্ধ উচ্চারণে ও শুদ্ধ বানানে বাংলা বলা ও লেখার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। কোনো কিছু লেখার আগে সন্দেহ দেখা দিলে অভিধান দেখে নেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। আমাদের অনেকেরই বাংলা বর্ণমালার ক্রম চটজলদি মনে না পড়ার কারণে অভিধান ওলটাতে গিয়ে সময়ক্ষেপণ হয়। তাই প্রত্যেক বাংলা অভিধানের শুরুতে বর্ণমালার তালিকাটি জুড়ে দিলে সাধারণের অনেক সুবিধা হবে।

আমরা অনেকেই উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও নৃ-গোষ্ঠী বোঝাতে ঢালাওভাবে 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যবহার করে চলেছি। কখনো কী ভেবে দেখেছি, এ ব্যাপারে আমার সংবিধান কী বলছে? একইভাবে মাননীয় সংসদ সদস্যদের অনেক ক্ষেত্রে 'সাংসদ' বলে অভিহিত করা হচ্ছে। কিন্তু বর্তমান মহামান্য রাষ্ট্রপতি যখন আমাদের জাতীয় সংসদের স্পিকার ছিলেন, তখন তিনি রুলিং দিয়েছিলেন সংসদ সদস্যদের 'সাংসদ' বলার কোনো সুযোগ নেই। বিভিন্ন শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার ভাষার বোধগম্যতাকে দুরূহ করেই চলেছে। এসব বিষয়ে আমরা কতটা সতর্ক?

চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রকৌশলসহ উচ্চশিক্ষায়, বিশেষত বিজ্ঞানের বেশকিছু বিষয়ে বাংলায় লেখাপড়া করা যায় না। ওইসব লেখাপড়ার পর্যাপ্ত পুস্তক বাংলায় প্রণয়ন বা অনূদিত হয়নি। ক্লাসে শিক্ষকরা বাংলা ও ইংরেজি মিশিয়ে পাঠদান করেন। এতে অনেক শিক্ষার্থীর পক্ষে ইংরেজি বই পড়ে বোঝা ও ইংরেজি লেকচার অনুসরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব বিষয়ে বাংলা ভাষায় লেখাপড়া করা যায় সেখানেও পর্যাপ্ত বইয়ের অভাব রয়েছে। পৃথিবীর বড় বড় লেখক, গবেষক, বিজ্ঞানীদের যেসব প্রবন্ধ, নিবন্ধ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হচ্ছে-সাহিত্য,

চিকিৎসা, অর্থনীতি, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে প্রতিবছর যারা নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন, তাদের অবদানের বাংলায় অনূদিত সংকলন আমাদের নেই। দু-একজন অনুবাদকের বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে দু-চারটা বইয়ের অনুবাদ দিয়ে সব শ্রেণির গবেষক, চিন্তক, সংস্কারকের জ্ঞানতৃষ্ণা মেটানো যাবে না। আমাদের অনুবাদকর্মের ওপর জোর ও পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে। এজন্য প্রয়োজন ধারাবাহিক ও সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ। আমেরিকার লাইব্রেরি অব কংগ্রেস, ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব মেডিসিন, স্টানফোর্ড ইউনিভার্সিটিসহ বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর অনেক প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন ভাষায় লিখিত পুরোনো আমলের বই ও গবেষণাকর্ম ইংরেজিতে অনুবাদ করে যাচ্ছে। একুশের চেতনায় আমাদের করণীয় হতে পারে উচ্চশিক্ষায় প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পাঠ্যবই, পৃথিবীর তাবৎ ভালো পুস্তক, রচনা, প্রকাশনার বাংলায় নিয়মিত অনুবাদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

আরেকটি বিষয় এখানে আলোচনা করা যেতে পারে, তা হলো ক্যালিগ্রাফি। এটি শিল্পকলার বহু পুরোনো ও সর্বজনগ্রাহ্য একটি শাখা। এটি পেইন্টিংয়েরই একটি ধারা। আরবি, চীনা ও জাপানি ভাষায় ক্যালিগ্রাফি উৎকর্ষের অনন্য সীমায় পৌঁছেছে। বাংলা ক্যালিগ্রাফিকেও সে পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। এখানে সৃজনশীলতা ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ আছে। বিভিন্ন কথা, বাক্য, শব্দ, উক্তি শৈল্পিকভাবে হরফের মাধ্যমে প্রকাশই হলো ক্যালিগ্রাফি। আর সে ক্যালিগ্রাফি নিজের মাতৃভাষার বর্ণমালায় শোভিত হলে এতে আবেগ ও ভালোবাসা যুক্ত হয়ে ভিন্ন মাত্রা লাভ করে। দেশে বাংলা ক্যালিগ্রাফির অপার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ভাষার মাসেই শুরু হোক দৃষ্টিনন্দন বাংলা ক্যালিগ্রাফির নতুন যাত্রা।

আমাদের দেশের মধ্যবিত্তের বাসাবাড়িতে টিভি চ্যানেলে হিন্দি ও বাংলা সিরিয়ালের কদর দিন দিন বাড়ছে। অনেকেই বলে থাকেন, ওইসব সিরিয়ালে পারিবারিক দ্বন্দ্ব-হিংসা-বিদ্বেষ, ঝগড়া, পরকীয়া, অন্যের ঘর ভাঙা সম্পর্কিত বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়ে থাকে। এসব থেকে আমাদের দর্শক কী শিখছেন? সারাক্ষণ যদি টিভিতে ওইসব অনুষ্ঠান দেখা হয় তাহলে তো মনমানসিকতাও ওইভাবেই গড়ে উঠতে পারে। আমাদের সমাজে পারিবারিক অস্থিরতা বৃদ্ধির জন্য ওইসব অনুষ্ঠানকেও অনেকে দায়ী করে থাকেন। আকাশ-সংস্কৃতির যুগে আমরা হয়তো ওইসব অনুষ্ঠানের প্রবেশাধিকার বন্ধ করতে পারব না; কিন্তু তাই বলে চুপচাপ বসে থাকাও যাবে না। উন্নতমানের রুচিসম্পন্ন গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, চলচ্চিত্র তৈরির মাধ্যমে দেশের দর্শকদের মনোজগতে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে হবে। স্বাধীনতার পর আমাদের নাটক, বিশেষত টেলিভিশন ও মঞ্চনাটক সৌকর্য ও উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছেছিল। দেশের সীমানা অতিক্রম করে সেসবের আবেদন ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। সে সময়গুলোকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। ভাষা আন্দোলনের মাসে আমাদের লক্ষ্য হতে পারে দর্শকদের দেশীয় সংস্কৃতিমুখী করা।

বিশ্বে বাংলা ভাষায় কথা বলা প্রায় ৩০ কোটি মানুষের অর্ধেকেরও বেশির বাস আমাদের এ ভূখণ্ডে। এ দেশের শীর্ষ ব্যক্তি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ এক

ভাষাতেই মনের ভাব প্রকাশ করছেন। তাই এ ভাষার শ্রীবৃদ্ধি, উৎকর্ষ সাধন, সমৃদ্ধি আনয়নে এ অঞ্চলের সব শ্রেণির মানুষকে, বিশেষত সুধীজনদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। বাংলা ভাষাচর্চার মূল কেন্দ্র হবে ঢাকা এবং আমরা হব অন্যদের পথিকৃৎ। এখানেই বাংলা ভাষার সেরা সাহিত্যকর্ম লেখা হবে, বিকশিত হবে এবং এখান থেকেই তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে। বাংলা ভাষা নিয়ে সবার আগে অহংকার করবে বাংলাদেশের জনগণ। আর তাই অন্য যে কোনো অঞ্চলের বাংলা ভাষী মানুষের তুলনায় আমাদের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ একটু বেশি থাকতে হবে।

লেখক : সরকারি চাকরিজীবী

বাংলা ভাষা বিশ্ব বাংলা পরিমণ্ডলের অন্যতম সমৃদ্ধশালী ভাষা

মনোজিৎ কুমার দাস

পৃথিবীর কোনো জাতিগোষ্ঠীর ভাষাই একদিনে জন্ম হয়ে বর্তমান অবস্থায় আসেনি। আমাদের মাতৃভাষা বাংলাও একদিনে সৃষ্টি হয়নি। বাঙালি ও তার ভাষা বাংলা ক্রমবিবর্তনের ধারায় এক হাজারের বেশি সময় ধরে নানা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। হাজার বছরেরও আগে আজকের বাংলা ভাষা শুনতে আজকের মতো ছিল না, বর্ণমালাও কিন্তু এ রকম ছিল না। শত শত বছর ধরে পরিবর্তিত হতে হতে আজকে বাংলা ভাষা বৈচিত্রময় ও সমৃদ্ধশালী হয়েছে। এখানে বলে রাখা ভাল, প্রত্যেকটা জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব সত্তার প্রধান বাহক হলো তার মুখে বলার ভাষা। দু'একটা ব্যতিক্রম ছাড়া মুখে বলা ভাষাই এক সময় লেখ্য রূপ নেয়। বাঙালি জাতির মুখের ভাষা হলো বাংলা ভাষা।

বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর মুখের ভাষা বাংলার বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য ঐশ্বর্যমণ্ডিত। এ ভাষার উৎপত্তি , বিবর্তন ও বিকাশ সম্পর্কে মতভেদ আছে। বাংলা ভাষার উৎপত্তি চর্যাপদ থেকে এসেছে বলে কোনো কোনো ভাষাবিদ মত প্রকাশ করেন। তবে কোনো কোনো ভাষাবিদ বাংলা সংস্কৃত ভাষা থেকে উৎপত্তি হয়েছে বলে দাবী করলেও স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন ও ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন যে বাংলার উৎপত্তি কোনভাবেই সংস্কৃত থেকে নয় বরং প্রাকৃত থেকে। এই প্রাকৃত ভাষা মূলত প্রাচীন কথ্য ভারতীয় আর্য ভাষারই শাখা। ড. চট্টোপাধ্যায় তার The Origin and

Development of Bengali Language বইতে প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তির মতকে সমর্থন করেছেন। প্রখ্যাত ভাষাবিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ । তাঁর মতে, 'গৌড়ী প্রাকৃত' থেকেই নানান বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে। আমাদের দেশের সবচেয়ে পুরনো ভাষার নাম 'প্রাচীন প্রাকৃত'। কালক্রমে 'প্রাচীন প্রাকৃত' অভিহিত হয় 'আধুনিক প্রাকৃত' রূপে। আধুনিক প্রাকৃত ভাষা থেকে শাখা-প্রশাখা গড়ে উঠে 'গৌড়ী প্রাকৃত', 'মাগধী প্রাকৃত' ইত্যাদি নামে আরো কয়েকটি প্রাকৃত ভাষার জন্ম হয়। কালের বিবর্তনে প্রাকৃত ভাষার আরো পরিবর্তন ঘটে নাম হয় অপভ্রংশ। এই অপভ্রংশ থেকে জন্মলাভ করে আসামের 'অহমিয়া' ভাষা, উড়িষ্যার 'উড়িয়া' ভাষা, ভারতের 'হিন্দি' ভাষা এবং এতদঞ্চলের 'বাংলা' ভাষা ইত্যাদি।

প্রাচীন বাংলার মানুষের কথ্য ও লেখ্য ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠা পেতে অনেক চড়াই উৎরাই করে। সত্যি কথা বলতে- প্রাচীন বাংলার পাল, সেন ইত্যাদি রাজাদের রাজত্বকালে বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটেনি বরং বাংলা ভাষার উপর পুরোপুরি আগ্রাসন চালানো হয়েছে। ভারতের দক্ষিণ কর্ণাটক থেকে আগত সংস্কৃতভাষী সেন শাসকরা বাংলা ভাষা নিষিদ্ধ করেন। সংস্কৃতকে রাজভাষা করা হয়। অধিকন্তু 'রৈবব' নামক নরকের ভয় দেখিয়ে বাংলা ভাষাকে সাধারণ মানুষ থেকে দূরে রাখার কৌশল করেন তারা। এই ভয়ে রাজকর্মচারী ও উঁচুবর্ণের মানুষেরা বাংলা ভাষা চর্চা বাদ দিলেও সাধারণ মানুষেরা তাতে কর্ণপাত করেননি। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির মাধ্যমে ১২০৩ সনে সেন শাসনের অবসান হলে বাংলার রাজভাষা করা না হলেও এ দেশীয়রা আবার নতুন করে বাংলা ভাষা চর্চা করার সুযোগ পান। বাংলায় নবাবদের শাসনামলেও কিন্তু বাংলা রাজ ভাষার মর্যাদা লাভ করতে পারেনি। রাজ দরবারের ভাষা উর্দু কিংবা ফার্সি ।

সুলতানি শাসনামলের প্রথম দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত ছিল বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী। হাজি শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ১৩৫২ সনে বঙ্গ, রাঢ়, গৌড়, পুণ্ড্রবর্ধন, লক্ষণাবতী, হরিকেল, সমতট ইত্যাদি বাংলাভাষী অঞ্চলকে একত্রিত করে 'সুবহি বাঙ্গালা' নাম দেন। আর এর অধিবাসীদের নাম দেন 'বাঙালি'। এতে বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পায় এবং বাংলা ভাষার পুনর্জন্ম হয়। এ সময় বড়ু চণ্ডীদাস 'শ্রী কৃষ্ণকীর্তন' (১৩৫০) কাব্য রচনা করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বন্ধ্যাত্ব ঘুচান। শাহ্ মুহাম্মদ সগীর 'ইউসুফ জুলেখা' (১৩৮৯-১৪১০) রচনা করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে রোমান্টিকতার আবির্ভাব ঘটান। পরবর্তীতে গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ, জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ্, রুকনুদ্দীন বারবাক শাহ্, আলাউদ্দীন হুসেন শাহ প্রমুখ মুসলিম নৃপতিদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বসু, জৈনুদ্দীন, বিজয় গুপ্ত, কৃত্তিবাস, বিপ্রদাস পিপিলাই প্রমুখ কবি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। মূলত পাঠান বংশের স্বাধীন সুলতানদের শাসনামলে (১৩৩৮-১৫৭৫) বাংলা ভাষার পুনর্জাগরণ হয়। এরপর মোঘল আমলে সৈয়দ সুলতান, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, আব্দুল হাকিম, দৌলত উজীর বাহারাম খান, কোরেশী মাগন ঠাকুর,

সৈয়দ আলাওল, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর প্রমুখের সাহিত্য সাধনায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু ১৭৫৭ সনে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলার শাসকের পরিবর্তনের সাথে ভাষা-সংস্কৃতিরও পরিবর্তন হয়। এতে মুসলিম শাসনামলের বাংলাভাষার পুনর্জাগরণ স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং নিম্ন মানের মিশ্রভাষার 'পুঁথি সাহিত্য' ও 'কবিয়াল গানে'র আবির্ভাব ঘটে। এ সময় ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজিকে করা হয় রাজভাষা। উল্লেখ্য মুসলিম শাসনামলে বাংলা ভাষায় আরবি, ফার্সি, উর্দু, পর্তুগিজ, হিন্দিসহ অনেক বিদেশি শব্দের সমাবেশ ঘটে। আর ইংরেজ শাসনামলে বাংলা ভাষায় যোগ হয় ইংরেজি, সংস্কৃত, ফরাসি, স্পেনিশসহ বিভিন্ন ভাষার অনেক শব্দ। এতে বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডার, সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য বেড়ে যায়। ইংরেজ শাসনামলের প্রথম দিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাঘাত ঘটলেও পরে উন্নতি সাধিত হয়। ইংরেজ শাসনামলেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব হয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শুধু কাব্য সাহিত্য পাওয়া যায়, এ সময় বাংলা ভাষায় কোনো গদ্য সাহিত্য রচিত হয়নি। অন্যদিকে ইংরেজ শাসনামলে বাংলা ভাষায় গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি গদ্য সাহিত্যের সূচনা হয়। যদিও এ সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ , দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়, জীবনানন্দ দাশ, মীর মশাররফ হোসেন, জসীম উদ্দীন প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর কাব্যচর্চার প্রারম্ভ কালপর্বে ইংরেজি ভাষায় 'ক্যাপটিভ লেডি' লিখে সাফল্য লাভ করতে না পেরে এক সময় বুঝতে পারেন সমৃদ্ধশালী বাংলা ভাষাকে অবহেলা করে তিনি অনুতপ্ত, তাই তিনি লেখন-

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;
তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
স্বপনে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,
"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,

বৈচিত্র্যময়, সৌন্দর্যে ঋদ্ধ বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চা করে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এক সময় তাঁর মাস্টার পিস 'মেঘনাদ বধ' কাব্য রচনা করে বাংলা সাহিত্যে নিজের আসন পাকাপোক্ত করলেন। পঞ্চকবির অন্যতম কবি অতুলপ্রসাদ বাংলা ভাষার গুণকীর্তন করলেন এক সময় এভাবে:

"আ মরি বাংলা ভাষা
মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাংলা ভাষা ।
তোমার কোলে,
তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালবাসা ।
আ মরি বাংলা ভাষা!
মোদের গরব, মোদের আশা,

আ মরি বাংলা ভাষা
কি যাদু বাংলা গানে!
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে ।
গেয়ে গান নাচে বাউল
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা ।
আ মরি বাংলা ভাষা!
মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাংলা ভাষা!
ঐ ভাষাতেই নিতাই গোরা,
আনল দেশে ভক্তি-ধারা।
আছে কৈ এমন ভাষা ।
এমন দুঃখ-শ্রান্তি-নাশা ।
আ মরি বাংলা ভাষা!
মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাংলা ভাষা!
বিদ্যাপতি, চণ্ডী গোবিন,
হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন :
ঐ ফুলেরই মধুর রসে ।।
বাঁধলো সুখে মধুর বাসা ।।
আ মরি বাংলা ভাষা!
মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাংলা ভাষা!
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে,
আনলো মালা জগত জিনে ।।
তোমার চরণ-তীর্থে আজি ।।
জগত করে যাওয়া-আসা ।।
আ মরি বাংলা ভাষা!
মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাংলা ভাষা!
ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে,
ডাকনু মায়ে 'মা, মা' ব'লে ।।
ঐ ভাষাতেই বলবো হরি,
আমি ঐ ভাষাতেই বলবো হরি
সাঙ্গ হ'লে কাঁদা হাসা ।।
আ মরি বাংলা ভাষা!
মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাংলা ভাষা!"

অতুলপ্রসাদের এই গানের মধ্যে বাংলা ভাষার বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য ও সম্ভাবনা নিহিত আছে এ কথা নির্দ্বিধার বলা যায়।

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যে নোবেল বিজয় বিশ্ব দরবারে বাংলা সাহিত্যের মর্যাদা অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতা,গান, গল্প, উপন্যাস , প্রবন্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে বিশ্বজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর গীতাঞ্জলি ও গীতবিতানের কবিতা ও গান বাংলার ভাষার অমূল্য সম্পদ। কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতা ও গানে বাংলা ভাষাকে ঋদ্ধ করেছেন , যা আমাদের বাংলা ভাষার সৌন্দর্য ও সম্ভাবনা প্রতীক হিসাবে চিরন্তন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে বলা শুরু করলে নজরুলের গানকে সম্মানিত করতে হয় দুর্দান্ত শক্তির একটা মাধ্যম হিসেবে। নজরুলের লেখা গান আর কবিতা 'চল চল চল' কিংবা 'দুর্গমগীরি কান্তার মরু', 'কারার ওই লৌহ কপাটের' মতো জাগানিয়া সব গান। চারণকবি মুকুন্দ দাস তাঁর গানে বাংলা ভাষাকে ঋদ্ধ করেছেন। তাঁর গান 'ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে' মতো গানগুলো আজও বাংলা ভাষার অপূর্ব সম্পদ। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পর্বের শহিদ ক্ষুদিরামের আত্মবলিদানকে স্মরণ করে বাঁকুড়ার লোক কবি পিতাম্বর দাসের

'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।'
'একবার বিদায় দে মা
হাসি হাসি পরব ফাঁসি
দেখবে ভারতবাসী।'

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তার 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা' গানটির জন্য বাংলা ভাষার দেশাত্মবোধক গান বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের উদ্দীপনার উৎস ।

ব্রিটিশ ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসনামল ও তার পূর্ব থেকে বৈচিত্র্যময় বাংলা ভাষা সাহিত্য, সঙ্গীতে ব্যাপক সমৃদ্ধি লাভ করলেও তা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায়নি। '৪৭ খ্রিস্টাব্দের দেশভাগের পর দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রায় হাজার মাইলে ব্যবধানে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ববাংলা (পরে পূর্ব পাকিস্তান) নামের দ্বিখণ্ডিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলে পূর্ব বাংলার অধিবাসীরা বাংলা ভাষা পূর্ববাংলার রাষ্ট্র ভাষা হবে বলে স্বপ্ন দেখল। তারা বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুললে কিন্তু উর্দুভাষী শাসকেরা বাঙালিদের দাবি উপেক্ষা করে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করল। এতে দারুণভাবে ক্ষুব্ধ হন এ দেশের সর্বস্তরের মানুষ। জেল-জুলুম, নির্যাতন-নিপীড়ন উপেক্ষা করে আন্দোলন করেন তারা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি (৮ই ফাল্গুন, ১৩৫৮ বাংলা) তারিখে ঢাকায় পুলিশের গুলিতে নিহত হন সালাম, বরকত, জব্বার, শফিক, রফিক, শফিউদ্দীনসহ অনেকে। বাংলা ভাষার অনেক কবি বায়ান্নর ভাষা শহিদদের স্মরণে মর্মস্পর্শী গান রচনা করেন। সে সব গানের মধ্যে আবদুল গাফফার চৌধুরীর কথা ও আলতাফ মাহমুদের সুরের 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো' গান ভাষা আন্দোলনকে বেগবান করে। তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে ১৯৫৬ সনে পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে

স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হলেও প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন পাকিস্তানি নামে মাত্রই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করে।

২৯ ফেব্রুয়ারির ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগকে স্মরণীয় করে রাখতে নির্মিত হয় ঢাকায় 'শহিদ মিনার'। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র বার শহিদ মিনারকে ভেঙে গুড়িয়ে দেয়।

বায়ান্ন ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক শাসকচক্র তাদের বর্বর সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদেরকে ২৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখে হত্যাযজ্ঞ শুরু করলে ২৬ মার্চ ১৯৭১ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তি সংগ্রামে তিরিশ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে '৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ নামে স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম লাভ করায় বাংলা ভাষা যথার্থভাবে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা লাভ করে। ফলে বৈচিত্র্যময় সমৃদ্ধশালী বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির দুয়ার খুলে যায়।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ জাতিসংঘের ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণা করে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় দুই শতাধিক রাষ্ট্র প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে এ দিবসটি পালিত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়েও বিশ্ব দরবারে বাংলাভাষার অবস্থান আজ সুসংহত হয়েছে। আর এ ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা অর্জনের জন্য আত্মত্যাগ করে বিশ্ববরণীয় হয়ে আছেন বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান ভাষা শহিদেরা।

বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধশালী বাংলা ভাষা আজ বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিম বাংলা, ত্রিপুরা, আসাম ইত্যাদি প্রদেশে স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রায় ৩০ কোটি বাংলাভাষী মানুষ আজ বিশ্ব বাংলার বাসিন্দা, তারা বাংলা ভাষাকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির দুয়ারে পৌঁছে দেবে।

বাংলা ভাষা ব্যবহার ও বাস্তবতা

ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ

বাংলা বিশ্বের ২২ কোটি মানুষের মাতৃভাষা, বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা ও সরকারি ভাষা। এক কালের 'ভাবের ভাষা' একালের কাজের ভাষাও বটে। বাংলাদেশের সরকারি অফিস-আদালত, বেসরকারি অফিস, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রসমূহ, সব পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় ও সমাজ জীবনের বিভিন্ন স্তরে বাংলা ভাষা বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, মননজীবী সবাই তাদের ধ্যান-ধারণায়, চিন্তা-চেতনায় ও কর্মজীবনে নানাভাবে বাংলা ভাষা ব্যবহার করছে। এটা অত্যন্ত আনন্দ, সুখ ও গর্বের বিষয়। কেননা ভাষা স্থবির নয় বরং জঙ্গম। তা প্রবহমান নদীর মতো দু'কূল ছাপিয়ে চলে উদ্দাম গতিতে। পথে নানা স্থান হতে সংগৃহীত হয় নানা উপকরণ যা ভাষাকে সতত সমৃদ্ধ করে চলে। তাই ভাষার বহুমাত্রিক ও কলেবর ক্রমাগত বেড়েই চলে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, কালের পর কাল। যুগ যুগ ধরে ভাষা সমৃদ্ধশালী হয়। পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয় নতুন আঙ্গিক ও অবয়বে।

বাংলা অনেক সমৃদ্ধ ভাষা। এর শব্দ ভাণ্ডার অফুরন্ত। রয়েছে নানা বৈচিত্র্য এবং মাধুর্য। শিক্ষিত সমাজ, শিক্ষকদের এবং গণমাধ্যমের জন্য একটি পরিমিত বাংলা ভাষা দরকার। শিক্ষকরা যদি নিজেই ভালো বাংলা না বলতে পারেন তাহলে শিক্ষার্থীদের শেখার কোনো সুযোগ নেই। আমাদের গ্রামে এবং শহরে মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলা পড়ানোর মতো ভালো কোনো শিক্ষক নেই। এটি একটি বড় সংকট। এক সময়ে স্কুলে পণ্ডিত মশাইরা ছিলেন যারা বাংলা পড়াতেন। শব্দের উৎপত্তি, বাংলা ব্যাকরণে তাদের ভালো দখল ছিল। রাজনৈতিক নানা কারণে সেই পণ্ডিত মশাইরা এখন দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। এসব শিক্ষক অত্যন্ত অধ্যবসায়ী ছিলেন। আমরা তথ্যপ্রযুক্তির ওপর জোর দিয়েছি তা ভালো কথা, তবে ভাষার দিকে কোনো খেয়াল নেই। এতে আমরা না পারছি ভালো বাংলা বা ইংরেজি শিখতে এবং বলতে। আমরা এখন দাবি করছি জাতিসংঘের ভাষা হবে বাংলা। সেজন্য যদি পরিভাষা তৈরি করতে না পারা যায়, তাহলে আমরা সমস্যায় পড়ব। এজন্য আইন, বিজ্ঞানসহ অন্যান্য বিষয়ের পরিভাষা তৈরি করতে হবে। কারণ জাতিসংঘ নানা আইন প্রণয়ন করে থাকে। বাংলাকে জাতিসংঘের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার আগে আমাদের উচিত হবে বাংলাকে আরো সমৃদ্ধ করা।

সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহার নিশ্চিত করার আগে জরুরি হলো আমরা শুদ্ধভাবে বাংলা বলতে এবং লিখতে পারি কিনা তা যাচাই করা। যারা বাংলায় লেখালেখি করেন তারা অবগত আছেন ব্যাকরণসম্মতভাবে বাংলা বাক্য তৈরি করা এবং শুদ্ধ বানানে বাংলা শব্দ লিখা কতটা কঠিন। প্রথমত, আমাদের কতকগুলো বিষয় আইনগত বাধ্যবাধকতার ভেতর নিয়ে আসতে হবে। দ্বিতীয়মত, আমাদের মনমানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। মাঝে মাঝে ইংরেজি বলতে এবং লিখতে পারা মানে বড় কিছু হয়ে হয়ে যাওয়া- এই মানসিকতা থেকে বের হয়ে আসা খুবই জরুরি। আর একটি বিষয় হলো বিশ্বায়নের যুগে আমাদের শিল্প-সাহিত্য চর্চা। এই বিষয় এখন সারা বিশ্বে আদান-প্রদান হচ্ছে।

এক দেশের সাহিত্য অন্য দেশে অনূদিত হচ্ছে এবং প্রভাব পড়ছে। বিশ্ব শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, স্থাপত্য জানতে হলেও আমাদের বাংলা ভাষার দুয়ার খুলতে হবে। পৃথিবীর সেরা সাহিত্যগুলো কিন্তু ইংরেজি ভাষায় নয়। আমাদের অনুবাদ সাহিত্য আরো বাড়াতে হবে। কালজয়ী বইগুলো বাংলায় অনুবাদ করতে হবে। আমাদের মনোজগতে ইংরেজি নিয়ে একটি ঔপনিবেশিকতা তৈরি হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসন নেই কিন্তু তাদের চিহ্ন থেকে আমরা বের হতে পারিনি। আমরা চাচ্ছি সর্বস্তরে বাংলা চালু হোক, বাংলা ভাষা যথাযথ মর্যাদা পাক কিন্তু এই ঔপনিবেশিক মনোভাব থেকে বের হতে না পারলে তা সম্ভব হবে না। আমরা খাদ্য দূষণ, ফরমালিন, ভেজাল তেল, দুধে পানি মেশানোসহ ভোগ্যপণ্যের বিষয়ে খুবই সচেতন। কিন্তু আমাদের ভাষা যে দূষণের কবলে সে বিষয়ে আমরা কথা বলি না। বর্তমানে এফএম রেডিওতে ভাষার কী পরিমাণ দূষণ হয়েছে তা বর্ণনাতীত। বাংলা ভাষার ঐতিহ্য হারিয়ে আমরা জগাখিচুড়ি মতো অবস্থায় উপনীত হয়েছি। বিভিন্ন জায়গা থেকে শব্দ

নিয়ে আমরা যে ভাষা তৈরি করছি তা আমাদের আত্মমর্যাদার জন্য অসম্মানজনক। বাংলা ভাষায় কিছু বিদেশি শব্দ রয়েছে যেগুলো আমরা বাংলা হিসেবেই গ্রহণ করেছি।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের একুশে ফেব্রুয়ারির চরম আত্মোৎসর্গের চেতনা ধারণ করে বাংলাদেশের মানুষ অবিরাম সংগ্রাম করে চলেছে বাংলা ভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার এক মহান ব্রতে। এই ভাষার দাবি কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল স্বাধিকারের আন্দোলন। এরই প্রেক্ষাপটে পরিচালিত হলো সশস্ত্র সংগ্রাম; অর্জিত হলো আমাদের মহান স্বাধীনতা। বাংলা ভাষাকে বিশ্বপরিমণ্ডলে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম কখনো থেমে ছিল না। অবশেষে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেসকো কানাডা প্রবাসী বাঙালি তরুণদের আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে একুশের চেতনা ধারণ করে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারিকে স্বীকৃতি প্রদান করে। এরপর ২০০০ খ্রিস্টাব্দে ১৬ মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে মাতৃভাষাকে যথাযথ মর্যাদাসহকারে বিশ্বের প্রতিটি দেশ উদযাপন করবে। উল্লেখ করা হয় বিশ্বব্যাপী সব মানুষের ভাষার সুরক্ষা এবং উপস্থাপনার সুযোগ সৃষ্টি করাই হবে লক্ষ্য। এ হচ্ছে ভাষাপ্রেমিক বাঙালি জাতির বিশাল অর্জন।

আজকাল অনেকেই মনে করেন ইংরেজি জানা লোকেরা হয়তোবা বাংলা ভাষার প্রতি তাদের অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। এটা কোনো প্রতিষ্ঠিত যুক্তি নির্ভর নয়। কেননা যারা নিজ মাতৃভাষা বা বাংলা ভাষায় সঠিক প্রয়োগ ও ব্যবহার জানেন না তারা অন্য কোনো ভাষায় দক্ষতা বা পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন এ কথা বলা যাবে না। প্রথমেই মাতৃভাষার শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করে সে অন্য কোনো ভাষায় দক্ষ হতে পারেন। সুতরাং বাংলা ভাষার শুদ্ধ উচ্চারণ, সঠিক ব্যবহার ও প্রয়োগ এবং সঠিক বানান রীতির ওপর বাঙালি হিসেবে সব বাঙালিকে অপরিহার্যভাবে যত্নবান হতে হবে। তাহলেই আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা একদিন আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হবে। আজকের দিনে যে ইংরেজি ভাষা পৃথিবীর সব রাষ্ট্র ও জাতিতে স্থান করে নিয়েছে বা গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে- সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে হয়তোবা আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলাও পৃথিবীর সব জাতি ও রাষ্ট্রের মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় ভাষা হিসেবে পৌঁছে যাবে এবং চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে। ক্রমে ক্রমে তা আন্তর্জাতিকতার মহিরুহে পরিণত হয়ে যথার্থ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হবে।

সর্বস্তরের বাংলা ভাষার প্রচলনকে গুরুত্ব দিয়েই ভাষা বিকাশের ধারাকে উজ্জীবিত রাখতে হবে। আমাদের মাতৃভাষা বাংলার বিকাশ সাধনে গবেষণা, অনুবাদ, পরিভাষা, শুদ্ধ ভাষার কথন ও উচ্চারণ, প্রমিত বাংলা বানানরীতি, ভাষানীতি ইত্যাদি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মাতৃভাষা বাংলার বিকশিত রূপই একদিন তাকে জাতিসংঘের ব্যবহারিক ভাষার দাবিতে পরিণত করবে এবং বাংলা হবে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা। আর এভাবেই বাংলা ভাষা বিশ্বায়নের উপরে এক গভীর ও সুবিশাল প্রভাব বলয় তৈরি করবে। আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদায়

প্রতিষ্ঠা লাভ করে বিশ্বের সব ভাষী মানুষের সাহিত্য সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে আরো মুখরিত করে তুলবে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে আমরা পৃথিবীর সব রাষ্ট্রের তাদের স্ব-স্ব মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে ভাষার ওপর কোনো ঔপনিবেশিক চাপ, চক্রান্ত ও ভাষা দূষণের মতো ন্যাক্কারজনক কাজকে সম্মিলিতভাবে প্রতিহত করার জন্য ভাষাপ্রেমিক সব মানুষের প্রতি উদার আহ্বান জানাচ্ছি।

লেখক: কলাম লেখক ও গবেষক।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলা ভাষা

মাজেদা বেগম মাজু

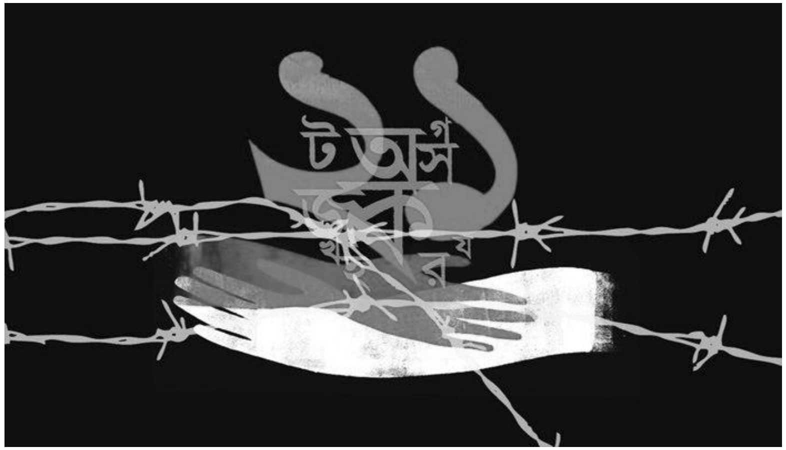

ভাবের আদান প্রদানের নামই হলো ভাষা। ভাবের বাহনই হলো ভাষা। ভাব প্রকাশের তাগিদেই ভাষার উদ্ভব। ভাষার প্রধান কাজই হলো একের ভাবনাকে অনেকের কাছে পৌঁছে দেয়া। এ যুগের শ্রেষ্ঠ ভাষা বিজ্ঞানী চমস্কির মতে, 'ভাষা কোনো যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। ভাষা মানুষের সৃজনী চেতনার সঙ্গে যুক্ত।' মায়ের কাছ থেকে শেখা ভাষাকে বলা হয় মাতৃভাষা। একটি জাতির জন্য তার মাতৃভাষা অনেক গুরুত্ব বহন করে।

বাঙালি জাতি হিসেবে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। মাতৃভাষা বাংলা অর্জনের পেছনে বাঙালির রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য। ভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বর্তমানে বাংলা পৃথিবীর চতুর্থ বৃহৎ মাতৃভাষা। বিশ্বের প্রায় ৩২ কোটি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলেন। ২০৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কেবল ১৪ থেকে ২৫ বছর বয়সী বাংলা ভাষীর সংখ্যা ৩৩ কোটি ৬০ লাখ ছাড়িয়ে যাবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। রাষ্ট্রের সংবিধান রচনা থেকে শুরু করে বাংলায় রয়েছে আমাদের অনেক অর্জন। একুশের

পথ ধরে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙালির ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতীক বাংলা একাডেমি। বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে 'প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ'। ভাষা বিশেষজ্ঞদের সাথে নিয়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে প্রকাশিত হয়েছে 'বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান'। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে শহিদ মুনীর চৌধুরী কর্তৃক আবিষ্কৃত হয় মুনীর কী-বোর্ড যা বাংলা বর্ণমালার জন্য প্রথম একটি বিজ্ঞানসম্মত প্রয়াস। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দেন বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে যাত্রা শুরু হয় উইকিপিডিয়ার বাংলা সংস্করণ। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ বাংলা ভাষা যুক্ত করে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্যে ভাষা শহিদদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য ও তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে দেশে বিদেশে গড়ে উঠেছে শহিদ মিনার। বিশ্বের যেখানেই বাংলা ভাষার জনগোষ্ঠী রয়েছে সেখানেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে শহিদ মিনার।

বাঙালির রক্তঝরা এ দিনটিকে সারাবিশ্বে স্মরণীয় করে রাখতে ইউনেস্কো (UNESCO) এই দিনকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সম্মান জানিয়েছে ভাষা শহিদদের প্রতি। বর্তমানে প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে সারাবিশ্বে পালিত হয়ে আসছে। আন্তর্জাতিকভাবে মাতৃভাষাকে স্বীকৃতির পেছনে যার অবদান সবচেয়ে বেশি স্মরণযোগ্য তিনি হলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এর প্রধান প্রস্তাবক কানাডা প্রবাসী বাংলাদেশের নাগরিক মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম ও তার সহযোগী আরেক বাংলাদেশি আবদুস সালাম। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সাতটি ভিন্ন ভাষার ১০ জন সদস্য দ্বারা গঠিত The Mother Language Lovers of the World Club (মাতৃভাষা প্রেমী সংগঠন)-এর মাধ্যমে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার প্রস্তাবটি ১৮৮টি সদস্য রাষ্ট্রের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

২০০০ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্বব্যাপী ১৮৮টি দেশে প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হওয়ার পর থেকে জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রে এখন শ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত হচ্ছে ভাষা শহিদদের নাম সেই সাথে উচ্চারিত হচ্ছে বাংলাদেশের নাম। ইউনেস্কোর পর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে জাতিসংঘও একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

বাংলা ভাষার মর্যাদা সমুন্নত রাখা এবং বাংলাসহ বিশ্বের বিকাশমান, বিপন্ন প্রায় সব মাতৃভাষার সংরক্ষণ, গবেষণা, উন্নয়ন ও সমন্বয় সাধন করার লক্ষ্যে ২০১০ খ্রিস্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার সেগুন বাগিচায় প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (IMLI) উদ্বোধন করা হয়। ৭ নভেম্বর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ ইউনেস্কোর

৩৮তম সাধারণ অধিবেশনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে দ্বিতীয় শ্রেণির (ক্যাটাগরি-২) প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দান করা হয় যা বাংলাদেশের কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রথম ইউনেস্কো কর্তৃক মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি।

বর্তমান বিশ্বের বাংলাদেশসহ তিনটি দেশের সরকারি ভাষা বাংলা। অন্য দু'টি দেশ হলো ভারত ও সিয়েরালিওন। ভারতে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত ভাষা রয়েছে ২২টি। এর মধ্যে অন্যতম হলো বাংলা। শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং দেশ গঠনে প্রায় পাঁচ হাজারের বেশি বাংলাদেশি সৈনিকদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০২ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর সিয়েরালিওনের প্রেসিডেন্ট ড. আহমেদ তেজান কাব্বা বাংলা ভাষাকে সিয়েরালিওনের সরকারি ভাষা (সম্মানসূচক) হিসেবে ঘোষণা করেন।

ইন্টারন্যাশনালাইজড ডোমেইন নেম ((IDM) একটি ইন্টারনেট ডোমেইন নেম সিস্টেম, যা ওয়েব ঠিকানা লিখতে প্রচলিত ইংরেজি ভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষা সমর্থন করে। কোনো একটি রাষ্ট্রের জাতীয় পরিচয়ের স্বীকৃতি হিসেবে কাজ করে এ ডোমেইন। ৫ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে IANA (Internet Assigned Numbers Authoritz) বাংলাদেশকে ডটবাংলা (Bangla) ডোমেইন ব্যবহারের চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়। ইন্টারনেটে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জাতীয় পরিচয়ের স্বীকৃতি হিসেবে কাজ করবে এ ডোমেইন। এর ফলে সারা পৃথিবীর বাংলাভাষী মানুষ ইন্টারনেটে নিজের ভাষাতেই বিভিন্ন ওয়েবসাইট ব্যবহার করতে পারবে।

বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে বর্তমানে বিশ্বজুড়ে বাংলা ভাষার চর্চা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বায়ান্ন পূর্ব ঊনিশ শতকে ঔপনিবেশিক আমলে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও পর্তুগালের মতো দেশগুলোতে বাংলাভাষা নিয়ে গবেষণার সূত্রপাত ঘটে। কয়েকজন বিদেশি পণ্ডিত-গবেষক, লেখক বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে লেখালেখি করে খ্যাতি অর্জন করেন। ব্রিটিশ ভাষাতাত্ত্বিক জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন ১৯০৩ থেকে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ২০ খণ্ডে আট হাজার পৃষ্ঠার 'লিঙ্গুইস্টিটক সার্ভে অব ইন্ডিয়া' নামের বিখ্যাত সমীক্ষা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে বাংলা ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষা নিয়ে তিনি গবেষণা ও অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ করেন। খ্যাতির তালিকায় আরো যারা রয়েছেন তারা হলেন উইলিয়াম কেরি বাংলা গদ্য বই লিখে, ম্যাক্সমুলার ভাষা নিয়ে কাজ করেছেন, ম্যানুয়েল-হ্যালহেড লিখেছেন বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ, মৈমনসিংহ গীতিকা বিষয়ে দুশান লিখেছেন চমৎকার বই, ডিরোজিও ম্যুলেন্স রচনা করেছেন কবিতা-উপন্যাস।

বায়ান্ন সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পর বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে দেশে বিদেশে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি হয়। বিদেশের একাধিক প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পাঠদানের ব্যবস্থা চালু হয়ে আসছে। এ ক্ষেত্রে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব স্টাডিজের (SOAS) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জন ভিক্টর বোল্টন, জন ক্লার্ক, উইলিয়াম রাদিচে প্রমুখ এই প্রতিষ্ঠানে বাংলার অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশের বাইরে সবচেয়ে বেশি বাংলাচর্চা হয় ইউরোপ ও

আমেরিকায় এই দুই মহাদেশে একাধিক নজরুল ও রবীন্দ্র সেন্টার রয়েছে। বর্তমানে বহির্বিশ্বের ৩০টি দেশের প্রায় ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়ানো হয়। রবীন্দ্র রচনাবলির ৩০ খণ্ড চীনা ভাষায় অনুবাদ হওয়া থেকে শুরু করে লালনের গান ও দর্শন জাপানি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। কয়েক দশক ধরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা অদিতি লাহিড়ী বাংলা রূপতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করছেন। বিশ্বের ছয়টি দেশের রাষ্ট্রীয় বেতারে বাংলা ভাষার আলাদা চ্যানেল রয়েছে। বাংলা ভাষায় যুক্তরাজ্য থেকে মোট ১২টি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হয়। ধুমকেতু, জন্মভূমি, প্রতিদিন, স্বদেশ-বিদেশ নামে পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়।

ইউরোপের মধ্যে বর্তমানে ইতালিতে পাঁচটি বাংলা ভাষার দৈনিক পত্রিকা এবং রোম ও ভেনিস শহর থেকে তিনটি বাংলা রেডিও স্টেশন পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া ডেনমার্ক, জার্মানি, সুইডেনসহ ইউরোপের আটটি দেশ এবং মধ্যপ্রাচ্যের ছয়টি দেশ থেকে বাংলা ভাষায় অনলাইন ও ছাপা কাগজের পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

বাংলা ভাষা এখন আর শুধু একটি দেশের ভৌগোলিক সীমারেখায় আবদ্ধ নেই। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিদেশিদের আকৃষ্ট করার কারণে বৈশ্বিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এর চর্চা ও গবেষণা। বিশ্বের নামীদামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা ও শিক্ষকতায় নিয়োজিত আছেন খ্যাতিমান পণ্ডিত ও গবেষকেরা। বিশেষজ্ঞদের ধারণা ইংরেজি, চীনা ও জাপানি ভাষার পরেই বাংলা ভাষা নিয়ে বিশ্বের আগ্রহ বাড়ছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এক সময় স্বমহিমায় বাংলা তার গৌরবোজ্জ্বল স্থান দখল করে নেবে একুশের চেতনায় এটাই হোক সকলের প্রত্যাশা।

লেখক : কলামিস্ট।

বাংলা ভাষার গৌরব গাঁথা ইতিহাস

ইউছুব ওসমান

প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি এলেই আমাদের হৃদয়ে দোলা দিয়ে যায় সালাম, রফিক, জব্বার, বরকত, শফিউরের স্মৃতি। শুনিয়ে যায় মনে শিহরণ জাগানো এক গান ‘ আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি। বাঙালির মনে বেজে ওঠে শোকগাঁথা এক করুণ সুর, আমাদের ভাই হারানোর গান। সাথে গর্বে বুক ফুলে ওঠে সেই শোকের চাইতেই বেশি। আমরা আমাদের বাংলা ভাষার অধিকার আদায় করে নিয়েছি আমার ভাইয়ের রক্তের বিনিময়ে, এটা অবশ্যই গৌরবের। এজন্যই একুশের চেতনা বয়ে চলুক প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম।

পৃথিবীর অন্য কোনো জাতি কি তাদের বুকের তাজা রক্ত রাজপথে ঢেকে দিয়েছিল ভাষার জন্য! বাঙালি দিয়েছিল বলেই বিশ্ব দরবারে বুক চিতিয়ে বলতে পারি 'বাংলা আমার মায়ের ভাষা'! ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশভাগের পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এদেশের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতির ওপর যে আগ্রাসন চালিয়েছিল তা ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়। দেশভাগের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব বাংলার জনগণের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি না দিয়ে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করে তা বাঙালিদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার যে প্রহসন চলতে থাকে, তা লড়াকু বাঙালি কখনোই মেনে নেয়নি।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের গণপরিষদে বাঙালি গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপন করলে তা নাকচ করে দেওয়া হয়। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সভা ওয়াকআউট করে চলে আসেন। বাঙালি ছাত্র সমাজে বইতে থাকে প্রতিবাদের ঝড়। গড়ে উঠে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা ও জোরপূর্বক বাঙালিদের মায়ের মুখের ভাষা হরণ করার ঘোষণা বাংলা ভাষী জনগণের মনে প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি করে।

১৪৪ ধারা জারি:

পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ এমন আকস্মিক ও অন্যায্য সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি। চারিদিকে বইতে থাকে প্রতিবাদের ঝড়। গড়ে ওঠে কঠোর আন্দোলন। ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক, সাধারণ মানুষ সবাই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। আন্দোলন দমনে ঢাকা শহরে মিছিল, সভা, সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ শে ফেব্রুয়ারি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান গভর্নরের সরকারি আদেশ অমান্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ মেডিকেল কলেজের অনেক সাধারণ শিক্ষার্থী ও রাজনৈতিক নেতাকর্মী একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেন এবং রাস্তা প্রদক্ষিণ করতে থাকেন। এতে কিছু সংখ্যক সাধারণ মানুষও যোগদান করেন।

মিছিলটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি এলে পুলিশ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অজুহাতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ শুরু করে। সালাম, রফিক, জব্বার, বরকতসহ নিহত হন অনেকেই। এছাড়াও আরও ১৭ জন শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হন। শহিদদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়ে যায়। হানাদারদের বর্বর হামলার এই খবর সারাদেশে বিদ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং বাঙালিদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হতে থাকে। ২১শে ফেব্রুয়ারি মিছিলে হামলা করে সাধারণ ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সারাদেশে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে।

২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্র, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও সাধারণ জনতা পূর্ণ সারাদেশে হরতাল পালন করে। ২২ ফেব্রুয়ারি আন্দোলন চলাকালে পুলিশের

গুলিতে নিহত হন শফিউর রহমান , রিক্সাচালক আউয়াল ও এক কিশোর। রক্তে রঞ্জিত হতে থাকে বাংলার রাজপথ। ভাষা আন্দোলনের শহিদ স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে রাতারাতি নির্মাণ করা হয় শহিদ মিনার। যা পরের দিন শহিদ শফিউরের পিতা উদ্বোধন করেন। একদিন না যেতেই পুলিশ সেই শহিদ মিনারও ভেঙ্গে ফেলে। তীব্র গণআন্দোলনের মুখে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার শেষ পর্যন্ত বাঙালিদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে পাকিস্তানের গণপরিষদে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয় এবং ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণীত হলে বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। রক্তের বিনিময়ে বাঙালি লাভ করে বাংলা ভাষায় কথা বলার অধিকার।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি:

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে বাংলাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে কয়েকজন প্রবাসী বাঙালির প্রচেষ্টায় ও বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন, জীবনদানের প্রতি সম্মান জানিয়ে ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। তারপর থেকে বিশ্বব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রতিবছর ২১ শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। যা বাঙালি হিসেবে আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের ও মর্যাদার।

ভাষার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়ে যারা বাংলাকে সারাবিশ্বের বুকে অত্যন্ত গর্ব ও মর্যাদার আসনে আসীন করে গিয়েছেন তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আমাদের শুধু ২১ শে ফেব্রুয়ারিতেই সীমাবদ্ধ। যা অত্যন্ত লজ্জার ও হতাশার একটি বিষয়।

শুধু ২১ শে ফেব্রুয়ারি এলেই আমরা আমাদের মাতৃভাষার প্রতি বিস্তর ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করি। কিন্তু আমাদের সারাবছরের কাজকর্মে তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায় না। বাংলা ভাষা নিয়ে আমাদের আবেগের প্রকাশ ঘটতে পারতো আমাদের সামগ্রিক জনজীবনে। শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, সাহিত্য সকল ক্ষেত্রেই এখন বিদেশি ভাষা আর সংস্কৃতিতে ছেয়ে গেছে। অথচ যেই ভাষার অধিকার আমরা রক্তের বিনিময়ে অর্জন করলাম তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন তো দূরে থাক বরং আরও অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়ে থাকে আজকাল। আমরা বিদেশি ভাষা, সংস্কৃতি জানাকে বর্তমানে যোগ্যতার মাপকাঠিতে বিচার করি অথচ বাংলাকে দেখি অবজ্ঞার চোখে।

শুধু ২১শে ফেব্রুয়ারি এলেই কেন আমাদের এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে? রক্ত দিয়ে অর্জিত ভাষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে সর্বক্ষেত্রে, সবসময়ই। ভাষা আন্দোলনের ৬৯ বছর, স্বাধীন বাংলাদেশের ৫০ বছর হয়ে গেলেও বাংলা ভাষার প্রতি, আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সম্মান আমরা যথাযথভাবে ধারণ করতে পারিনি। যা আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জার। বাংলা ভাষার

সার্বজনীন প্রচলন ও ব্যবহার নিশ্চিতের মাধ্যমে ভাষা শহিদদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা না গেলে সারাবিশ্বে রক্ত দিয়ে অর্জিত বাংলা ভাষার যে মর্যাদা তা অক্ষুন্ন রাখা সম্ভবপর হবে না। নিজের ভাষাকে উপেক্ষা করে বিদেশি সংস্কৃতি ও ভাষা চর্চার যে মহা আয়োজন বর্তমানে চলছে সেই প্রক্রিয়া থেকে আমাদের দ্রুত বেরিয়ে আসা এখন সময়ের দাবি।

বাংলা ভাষার অবমাননা:

সেই সাথে শিক্ষা, শিল্প,সাহিত্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, সিনেমাসহ সকল ক্ষেত্রেই বাংলা ভাষার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী। তা না হলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের নিজস্বতা বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। বর্তমান সময়ে বাংলা ভাষার অবমাননা যেন একটা সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের যুবসমাজ বাংলাকে বিভিন্ন ভাষার সাথে মিশ্রণ ঘটিয়ে যে অগ্রহণযোগ্য ধারার প্রচলণ করেছে তা বাংলাকে করুণভাবে অপমানিত করে চলেছে। বিশ্বায়নের বিরূপ প্রভাব ও আমাদের উদাসীনতা বর্তমানে বাংলা ভাষার অস্তিত্বকেই হুমকির মুখে ফেলেছে।

প্রমিত বাংলা চর্চায় আমাদের অনীহা ও বিদেশি ভাষার প্রতি আমাদের অনুরাগ আমাদের বাংলা ভাষার বর্তমান সময়ের করুণ অবস্থার অন্যতম কারণ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। এখনই এ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন করা না গেলে অদূর ভবিষ্যতে বাঙালি হিসেবে আমাদের অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়বে। শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলা ভাষার যথাযথ সম্মান রক্ষা ও ভাষা শহিদদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের জন্য সার্বজনীন বাংলা ভাষার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

সেই সাথে শুদ্ধ ও প্রমিত বাংলা ব্যবহারে সকলের মধ্যে সচেতনতা তৈরিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী। এ বিষয়ে আমাদের তরুণ সমাজেরও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে বাংলাকে বিশ্ব দরবারে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন যেসব ভাষা শহিদেরা তাদের প্রতি আমাদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। তাদের পরিবারের সদস্যদের পাশে আমাদের দাঁড়াতে হবে। একুশের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে ভাষার প্রতি, আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি আবেগের বহিঃপ্রকাশ সর্বক্ষেত্রেই দেখাতে হবে। তবেই যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা সহজতর হবে। বাংলা ভাষার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা ও প্রমিত বাংলার ব্যবহার নিশ্চিতই হোক আমাদের এই মহান ভাষার মাসের অঙ্গীকার। বাংলা ভাষা বিশ্বের বুকে সম্মানের সহিত অধিষ্ঠিত থাকুক চিরকাল। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রমিত বাংলা বয়ে চলুক যথাযথ সম্মানের সাথে এটাই প্রত্যাশা।

বাংলা ভাষার হালচাল

লুৎফর রহমান

আমাদের ব্যবহারিক জীবনে বাংলা ভাষার ব্যবহার প্রায় উঠে যাই যাই অবস্থায় পৌঁছেছে। বৃহত্তর নিরক্ষর, সাক্ষর, স্বল্পশিক্ষিত সাধারণ মানুষ তাদের প্রতিদিনের সামাজিক বিনিময়ের ভাষা হিসেবে লোকভাষা ব্যবহার করেন। তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভাষা অভিন্ন। তাই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্ব-স্ব আঞ্চলিক বাংলা ভাষার স্বাভাবিক চলনটি বিদ্যমান। আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়, বৈদেশিক যোগাযোগ ইত্যাদি অপর ভাষী মানুষের সঙ্গে যাবতীয় যোগাযোগের ভাষা ইংরেজি। এবং এসব কাজে ইংরেজির ব্যবহার ঔপনিবেশিক কাল থেকেই প্রচলিত।

ভাষার সংকটজনক অবস্থা অন্যত্র বিরাজমান। শিক্ষিত মানুষের ভাষা ব্যবহারেই সমস্যাটি স্পষ্ট ও প্রকট হয়ে ধরা পড়ে। তরুণতর বাংলাদেশি শিক্ষিতজন থেকে প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় দাঁড়ানো বাঙালির ভাষা এক সর্বনাশা জটিলতায় সমাচ্ছন্ন। মৌখিক কথাবার্তায় ইংরেজি, হিন্দি, বাংলার মিশেলে তারা এক অদ্ভুত খিচুড়ি ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। আর এক ভাষা যা তথাকথিত সামাজিক (যদিও তা সমাজ কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ) যোগাযোগমাধ্যমের ভাষা। সে ভাষা ‘বর্ণ’ ‘শব্দ’ ‘চিহ্ন’ প্রতীকের ভাষা। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের ভাষীরা যদি ধীরে ধীরে শেষোক্ত

ভাষাটিকেই তাদের প্রাত্যহিক সামাজিক প্রয়োজনে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে নির্বাচন করে, তবে 'মান বাংলা' বলতে কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না। এবং সেই বিপর্যয়ের দিনে বাংলা ভাষার বিপন্ন অস্তিত্বের আদলটি কী হবে- সেটিই ভাবনার বিষয়। দ্বিতীয়ত, সমস্যাটি বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার্থীদের ভাষা ব্যবহারে ভিন্নরূপে দৃশ্যমান।

প্রাইভেট স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানোর ফাঁদে বিদ্যার্থী ধরার রেওয়াজ আছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সিংহভাগই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যা বিতরণ করেন। ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসেও তিনি ইংরেজি লেকচার শিট (হালে লেকচারের পরিবর্তে প্রশ্ন ও শিট দেওয়ার রেওয়াজ চালু আছে) বিতরণ করেন। ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কাট-পেস্ট পদ্ধতিতে তৈরি শিট পড়ে বিদ্যার্থীরা তাই উত্তরপত্রে উগরে দেন। ফলে প্রতিষ্ঠান বা সরকারের ঘোষণা ব্যতীতই শিক্ষার মাধ্যম হয়েছে ইংরেজি। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এসব তথ্য-তালাশের ধার ধারে না। অতএব, বিপন্ন গরিব ঘরের সন্তানটি। তিনি ইংরেজি মাধ্যমে পড়ার সুযোগ পাননি, যত অপরাধ ও যন্ত্রণা তার। কারণ তিনি ওই ঔপনিবেশিক ভাষাটি ভালো জানেন না। আর এক সংকট কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের অজ্ঞতাজনিত।

সেদিন অনলাইন ক্লাসে একজন বিদ্যার্থী বলল, 'আমি বাংলায় কম্পোজ করবার পারি না, অ্যাসাইনমেন্ট কীভাবে পাঠাব?' তাকে বললাম, যেহেতু তুমি জার্মানিতে বসবাস করো, জার্মান ভাষায় লিখবে। মুখে ও-কথা বললেও কিন্তু তার সমস্যাকে খাটো করে দেখা যায় না। বাংলা সাহিত্যের শিক্ষক আমি। বিদ্যার্থীর সমস্যা সমাধান করাই শিক্ষকের দায়িত্ব। তবে তাকে তো বলতেই হয়, তুমি ইংরেজিতে বাংলা পরীক্ষা দিও। আমার সমস্যা আর কারও জীবনকে স্পর্শ নাও করতে পারে; কিন্তু একে কি খাটো করে দেখব? না, তার উপায় নেই। নেই যে, তার পেছনে অনেক কথা বিস্তারে বলার অবকাশ এখানে নেই। এ-কথা অবশ্যই বলা যায়- এসব সমস্যার মূলে যান্ত্রিক কোনো কারণ আছে কিনা, তা সংশ্লিষ্ট বাঙালি বিজ্ঞানীই বলতে পারবেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় বিদ্যার্থীরা বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়। তা নয় বলেই বর্ণমালার পরিস্কার স্পষ্ট জ্ঞান নেই।

উৎপত্তিকাল থেকেই বাংলা ভাষায় সংযুক্ত বর্ণ; হ্রস্ব-ই; দীর্ঘ-ঈ; হ্রস্ব-উ, দীর্ঘ-ঊ; দন্ত-ন; মূর্ধণ্য-ণ, য-ফলা, রেফ '-ˊ', 'র-ফলা' তিনটি 'শ' ঘটিত সমস্যা বিদ্যমান। আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, বাংলা একডেমি ইত্যাদি জাতীয় প্রতিষ্ঠান তা অবহিত। সব শিক্ষার্থীর হাতে ল্যাপটপ তুলে দেওয়ার আগেই উপরিকথিত প্রতিষ্ঠানের অবশ্যই এ সমস্যার একটি সুষ্ঠু সমাধান করা উচিত ছিল। বিজ্ঞানকে রোখা যাবে না। প্রগতির ধারা সচল রাখতে হবে। তার জন্য সর্বাবস্থায় প্রস্তুত থাকাই তো বেঁচে থাকা। এখানেই ভুল পাহাড় গড়েছে। প্রযুক্তি বিক্রেতা দেশের ফর্মুলা নিয়ে আমরা একবারও ভাবতে পারিনি, যে-সৃজনশীল

শিক্ষাব্যবস্থা আমরা চালু করতে যাচ্ছি, তা মূলত 'উদ্দীপক' নামক পরিভাষার দাসত্ব।

মানুষের সৃজনক্ষমতা স্বয়ংক্রিয় স্বভাব। না হলে পৃথিবীর সব বিজ্ঞানীই উদ্দীপিত হয়ে আইনস্টাইন হতেন। ইতোমধ্যে এ ব্যবস্থার ব্যবহারিক ফল আমরা পেতে শুরু করেছি। 'সৃজনশীল শিক্ষা' র নামে বর্ণ পরিচয় পর্যন্ত শিশুদের শেখানো হচ্ছে না। তাই 'কি- বোর্ডে' সব বর্ণ এবং 'কার' চিহ্নাবলি থাকার পরও বিদ্যার্থীরা বাংলা টাইপ করতে পারছে না। অর্থাৎ বাংলা ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণ, সংযুক্ত বর্ণ, কার-চিহ্ন ও ফলাদি, রেফ '-ˊ' চিহ্ন উত্তমরূপে শেখানো অত্যন্ত জরুরি। অভ্র সফটওয়্যার ব্যবহারে অভ্যস্ত বিদ্যার্থী এবং পরবর্তীকালের সব পেশার কর্মকর্তা-কর্মচারী শিক্ষিতজন বাংলা হরফে বাংলা না লিখে যদি ইংরেজি হরফে লিখে তবে তাকে দোষী করা যাবে কি?

নিত্যপ্রদর্শিত টেলিভিশন নাটক দেখলে বিপাকে পড়তে হয়। তাদের উচ্চকণ্ঠ সংলাপ-অভিনয় নারী-পুরুষের দাঁত-মুখ খিঁচানো ঝগড়ার স্মৃতিই স্মরণ করায়। এবং দেখতে দেখতে অভিনয়ের 'অ', শিল্পের 'শ' মিলে 'অশিক্ষিত' নয়তো 'অশিষ্ট' শব্দ দুটিই তাদের উদ্দেশ্যে ছুড়তে ইচ্ছে করে। মান্ধাতার কালের 'ঢাকাই ভাষা', নয়তো 'নোয়াখালী অঞ্চলে'র পুরাতন লোকভাষা কিংবা চলিত, সাধু, লোকভাষার খিচুড়ি হালের নাটকের সংলাপের ভাষা। আরও দেখা যাবে- নাটকের পণ্ডিত লেখক, শিক্ষিত অভিনয়শিল্পী সবাই যেন ভয়ংকর এক পাগলামি রোগে আক্রান্ত। পাগলামি না করে থাকতে পারছেন না কেউই। তাদের রোমান্টিক সংলাপগুলোও ঝগড়ার স্বরভঙ্গিতে তারস্বরে উচ্চারিত। এবং তারা যে কোন্ বাংলা ভাষায় কথা বলে, তা আবিষ্কার করাও দুঃসাধ্য। আর এক দল ফতোয়াবাজের আবির্ভাব হয়েছে বাংলাদেশে। তারা সাহিত্য-শিল্পকলাকে সমাজবিজ্ঞানের সূত্র দ্বারা, মনোবিজ্ঞানের পরিভাষা দ্বারা বিচার করতে গিয়ে ধর্মীয় ফতোয়াবাজদের মতোই ইতোমধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। ভুলে যাওয়া অনুচিত, শিল্প-সাহিত্য সর্বাংশে সমাজবিজ্ঞান নয়। যতটুকু জীবনকে, জীবনের বিচিত্র অভিব্যক্তিকে উপস্থাপন করার জন্য প্রয়োজন, শিল্প-সাহিত্য অপর শাস্ত্রের ততটুকুই গ্রহণ করবে। সাহিত্যের শাস্ত্র রয়েছে তার নিজস্ব- যে-শাস্ত্র সমাজতত্ত্বের হাজার হাজার বছর আগে সৃষ্ট। সমাজতত্ত্বের দাসত্ব করতে গিয়ে শিল্প-সাহিত্য তাদের নিজস্ব গৌরবময় অস্তিত্ব বিসর্জন দেবে, এমনটি কেবল সভ্যতার গোধূলিমাখা অন্ধকারেই ভাবা যায়।

ভাষাবিভ্রাটের আর এক জগৎ সেলফোন। সেখানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বলে এক অদৃশ্য পৃথিবীর সমাজকে নির্দেশ করে, যার অবস্থান হাওয়ায়। সত্য-মিথ্যা, যুক্তি-প্রমাণ, ভুল-শুদ্ধ, ন্যায়-অন্যায় কর্মকাণ্ডের জন্য কোনো দায় নিতে হয় না। খাজনা-ট্যাক্সের কোনো বালাই নেই। 'লাইক শব্দ'টি সেখানকার 'এনআইডি'। সেই পৃথিবীর বাসিন্দাদের এক বাংলা ভাষা রয়েছে। সে বাংলা ইংরেজি হরফে লিখতে হয়। অথচ আমাদের পূর্বপুরুষেরা উর্দু হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাবে অপমানিত বোধ করে রাজপথে নেমেছিল। সে ইতিহাস রক্তরঙে বাংলা ভাষায় লেখা। আজ আমাদের আত্মসম্মানবোধ বিলুপ্ত। যেন স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিকের কোনো

আত্মসম্মানবোধ থাকতে নেই। প্রয়োজন নেই সু শিক্ষিত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আত্মসচেতন যুগমানুষ হওয়ার।

আমাদের অপকীর্তির ভয়াবহতা প্রতিদিনের সংবাদমাধ্যমে সর্বাধিক প্রচারিত বিষয়। অহিংস জাতীয়তাবোধ মানবতার জন্য কখনও ক্ষতিকারক কিছু নয়- বরং জাতীয় নেতৃত্বের বলিষ্ঠতায় তা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে। উন্নত রাষ্ট্রগুলো ভাষাকেও অপর শক্তির সমকক্ষ জ্ঞান করে। বাংলাদেশে ভাষা দারুণভাবে অবহেলিত। সংলাপে একটি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করতে পারলে আমরা ধন্য মনে করি নিজেকে। বাঙালি আত্মঘাতী- সে তো পুরোনো কথা। কথা বললেই কথা বাড়ে। প্রকৃত সত্য এই, ভাষার সমৃদ্ধিকরণ কাজটি কার্যত ভাষাবিজ্ঞানীদের। 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট', বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক ভাষাবিজ্ঞান বিভাগগুলো এবং বাংলা একাডেমি, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকভাষা সংগ্রহ করে নির্বাচিত শব্দগুলোকে অভিধানভুক্ত করলে বাংলাদেশের মানভাষা সমৃদ্ধ হতে পারে। উন্মোচিত করতে পারে নদীয়া-কৃষ্ণনগরের লোকভাষার সংস্কৃত রূপ প্রমথ চৌধুরীর সবুজ পত্রের কথ্যভাষার কবল থেকে সর্ববঙ্গীয় এক 'মানবাংলা' সৃষ্টির পথ।

আধুনিক বাংলা ভাষার বিকাশে এরূপ পদক্ষেপ হতেই পারে সহায়। প্রত্যেক শিক্ষিতজনের নিজ ভাষা, মাতৃভাষার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা থাকাও অতি জরুরি। ভাষার নিরাপত্তা বিধান করতে হবে ব্যবহারকারীকেই। কোরবানির চাঁদ দেখলেই গরু খোঁজার মতো ফেব্রুয়ারি মাস বা ভাষার মাস এলেই মাতৃভাষার জন্য মায়াকান্না করার কোনো অর্থ নেই; উপকৃত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও নেই। বাচ্চার অক্ষরজ্ঞান দানের সময় থেকেই ভাষার প্রতি তাকে শ্রদ্ধাশীল, যত্নশীল করে গড়ে তুলতে হবে। ঔপনিবেশিক মন আমাদের।

বাচ্চা কথা বলতে শিখলেই তার মুখে ইংরেজি শব্দ তুলে দেন মা- তবে তো ওই শিশুর মাতৃভাষা ইংরেজিই হলো! শিক্ষিত মা বাংলা ভাষায় 'বাচ্চা' শব্দটি থাকা সত্ত্বেও 'বেবি' বলে নিজেকে সংস্কৃতিবতী মনে করেন। ইদানীং তরুণ সমাজে 'ভালোবাসি' শব্দের পরিবর্তে 'সে কমলকে লাভ করে'র মতো হাস্যকর ব্যবহার চালু রয়েছে। অর্থহীন স্মার্টনেস প্রদর্শনে এখন 'ভাত দাও' না বলে খেতে বসে 'রাইস দাও'; 'তরকারি' না বলে 'এই আর একটা কারি দাও এখানে' বলছি এবং তাতে বক্তা অহংকারও বোধ করেন। জীবনাচরণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এভাবেই প্রতিদিন ভাষা ধ্বংসের 'কভিড-১৯'এর জীবাণু প্রবেশ করছে।

লেখ্যরীতির বাংলা ভাষাকে বাঁচাতে হলে এসব সমস্যার জীবাণু ধ্বংস করার মতো প্রতিষেধক চাই। জীবন বদলাবে, সংস্কৃতির শরীরে লাগবে রূপান্তরের ছোঁয়া, অথচ ভাষা বদলাবে না, তা হয় না- অনিবার্য, যা তাকে সবাই মিলে প্রয়োজনানুগ করাই যৌক্তিক; কথার কথা এটাই।

লেখক : প্রাবন্ধিক, শিক্ষাবিদ

যাঁদের রক্তে রঞ্জিত, প্রিয় বর্ণমালা

রোকেয়া বেগম রুকু

অবিচার ছিলো বলেই তার থেকে জন্ম নিয়েছে অসন্তোষ।
অত্যাচার ছিলো বলেই তার থেকে জন্ম নিয়েছে আন্দোলন।

কেননা বাঙালির মুখের ভাষা কাড়তে গিয়ে কায়দে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাও সেদিন নিষ্কৃতি পায়নি।

আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গৌরবময় ঘটনা বায়ান্ন এবং একাত্তর। কেননা বায়ান্নের সিঁড়ি বেয়েই পেলাম একাত্তর। ভাষা আন্দোলন থেকেই আমাদের স্বাধীকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরু। এর ধারাবাহিকতায় চুয়ান্ন খ্রিস্টাব্দে ঘটেছিলো যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী বিজয়। ছেষট্টি খ্রিস্টাব্দে ছয় দফা আন্দোলনের সূত্রপাত; ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে একাত্তরের স্বাধীনতা অর্জন। তাই ভাষা সৈনিকরাই ছিলেন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সৈনিক, পথ প্রদর্শক। ভাষা শহিদদের সেই রক্তঝরা দিনটি ছিল বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি। অমর একুশ উপলক্ষে প্রতিবছর প্রভাতফেরিতে ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই শহিদ মিনারে। কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি-

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি

আমি কি ভুলিতে পারি।'

২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার মিছিলে প্রতিবাদী হাত রক্তাক্ত হয়েছিল অনেকের। অবশেষে ৫২ এর ভাষা আন্দোলনে ভাষা শহিদদের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয় বাংলা ভাষা।

বাঙালির ভাষা আন্দোলন মানব জাতির মহাকাব্যের উজ্জ্বল ইতিহাস। পৃথিবীতে বাঙালি একমাত্র জাতি, যারা মাতৃভাষার অধিকার ও মর্যাদার সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করেছে এবং বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে।

"ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময়ও বলবো আমি বাঙালি,
বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা।"

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দিয়ে মাতৃভাষার গুরুত্ব বাড়িয়ে দেন। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি আদায়ের উদ্যোগ নেন। ভাষা আন্দোলনের ফসল শহিদ মিনার, বাংলা একাডেমি ও মাসব্যাপী বইমেলা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ভাষা আন্দোলন মিউজিয়ামসহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন।

বাঙালির দৃষ্টিতে মা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির অধিকার ও মর্যাদা সমান্তরাল, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ। ভাষাতত্ত্বের আলোচনা এক জায়গায় থেমে নেই, দৃষ্টিকোণেরও ব্যাপক বদল ঘটেছে। শত প্রতিকূলতার মাঝেও বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার উন্নয়ন উৎকর্ষ ও সম্ভাবনা বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধি পাচ্ছে। চলমান ধারা অব্যাহত থাকলে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন বেশি সময়ের ব্যাপার নয়। তবে শুধু দেশে নয় বহির্বিশ্বে বাংলা ভাষা প্রচলনে আরও আন্তরিক উদ্যোগী ও উদ্যমী হতে হবে।

পৃথিবীর মধুরতম ভাষা বাংলা। এটি একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী ভাষা। বাংলা ভাষার অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে বাঙালি জাতি, যা বিশ্বে নজিরবিহীন। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের বাংলায় ভাষণ ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃত উৎকৃষ্ট ভাষণ। এতে এটাই প্রমাণিত হয় বঙ্গবন্ধু বাংলা ভাষাকে সুউচ্চ মর্যাদায় নিয়ে গেছেন।

ভাষা আন্দোলনের এত বছর পরেও আজ মাথা উঁচু করে বলতে ইচ্ছে করে বাংলা ভাষাকে ভালোবাসি, শুদ্ধ বাংলায় কথা বলি। দেশের সর্বস্তরে বিশুদ্ধ বাংলা ভাষার বাতাস বয়ে যাক। যেমনটি শুনেছিলাম ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় কণ্ঠস্বর। ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে বিশ্বব্যাপী মহিমান্বিত করছে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারির আন্দোলনে রফিক, শফিক, সালাম, জব্বার, বরকত ও অহিউল্লাহসহ নাম না জানা অনেকে শহিদ হন। যাঁদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে বাংলাভাষার বর্ণমালা তাঁদের জীবনালেখ্য উপস্থাপন করা হলো।

শহিদ রফিক উদ্দিন আহমদ

ভাষা শহিদ রফিক ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ অক্টোবর মানিকগঞ্জ জেলার পারিল গ্রাম বর্তমানে রফিকনগর ইউনিয়ন-বলধারা, থানা-সিঙ্গাইরে জন্মগ্রহণ করেন। পারিল গ্রামটি খুব সুন্দর সবুজ ফসলি একটি গ্রাম, যে গ্রামে সারা বৎসর ধান, পাট ও সবজির আবাদ হয়। শহিদ রফিকের পুরো নাম রফিক উদ্দিন আহমেদ। পিতার নাম আবদুল লতিফ মিয়া এবং মাতার নাম রাফিজা খাতুন। ভাষা শহিদ রফিক পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে বড় ছিলেন। অন্য ভাইদের নাম রশিদ, মুক্তিযোদ্ধা খালেক, সালাম ও খোরশেদ আলম।

শহিদ রফিক তার বাড়ি থেকে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত বায়রা উচ্চ বিদ্যালয় হতে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। পরে মানিকগঞ্জের দেবেন্দ্র কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হন। বাবার প্রিন্টিং ব্যবসা দেখা শুনার জন্য পরবর্তীতে তিনি ঢাকায় চলে আসেন।

শহিদ রফিক একই গ্রামের মেয়ে রাহেলা খাতুন পানুকে ভালোবাসতো। পারিবারিকভাবে তাদের এই ভালোবাসাকে মেনে নিয়ে পরিবার থেকে বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করা হয়। সেই উপলক্ষেই বিয়ের বাজার করার জন্য তিনি ঢাকায় যান। ২১ ফেব্রুয়ারি বিয়ের শাড়ি-গহনা ও কসমেটিকস নিয়ে সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু এই মহান ব্যক্তি যখন শুনতে পেলেন বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে থেকে মিছিল বের হবে তখন তিনি ছুটে যান এই মিছিলে।

সরকার কর্তৃক আরোপিত ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে ১৯৫২ এর ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র জনতার সাথে তিনিও বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। তখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেল প্রাঙ্গণ ও মিছিলের পদভারে প্রকম্পিত পুরো রাজপথ। এ অবস্থা দেখে পাকিস্তান সরকার দিশেহারা হয়ে ওঠে। ফলে নির্বিচারে ছাত্র জনতার উপর গুলি বর্ষণ শুরু করে। একটি গুলি রফিক উদ্দিনের মাথায় বিদ্ধ হয়ে মাথা ঝাঁঝরা হয়ে যায় ঘটনা স্থলেই রফিক শহিদ হন। মেডিকেল হোস্টেলের ১৭ নম্বর রুমের পূর্বদিকে তার লাশ পড়ে ছিলো। ছয়-সাত জন ধরাধরি করে তার লাশ এনাটমি হলের পেছনের বারান্দায় এনে রাখেন। তাদের মাঝে ডা. মোশারফুর রহমান খান

গুলিতে ছিটকে পড়া রফিকের মগজ হাতে করে নিয়ে যান। শহিদ রফিকই সম্ভবত পৃথিবীতে ভাষার জন্য প্রথম শহিদের মর্যাদা লাভ করেন।

তবে পাকিস্তানি হায়েনারা তাকে মেরেই ক্ষান্ত হয়নি ঢাকা মেডিক্যাল থেকে তার লাশ লুকিয়ে ফেলে এবং জনরোষের ভয়ে পরদিন সেনাদের সহযোগিতায় আজিমপুর কবরস্থানে রাত তিন টায় সামরিক বাহিনীর প্রহরায় শহিদ রফিককে দাফন করে। কিন্তু তাঁর কবরের কোনো চিহ্ন রাখা হয়নি। ফলে আজিমপুর কবরস্থানে হাজারো কবরের মাঝে ভাষা শহিদ রফিকের কবরটি অচিহ্নিত থেকে গেলো। এই মহান লোকটি নিজের ভালোবাসার মানুষকে ফেলে, নতুন জীবনের সমস্ত আশাকে বিলিয়ে দিয়ে তিনি আমাদের মায়ের মুখের ভাষাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন। শহিদ রফিক তার ভালোবাসার 'পারিল' গ্রামে ফিরে যেতে পারেনি। তিনি ঢাকার বুকেই চিরনিদ্রায় শায়িত হয়ে রইলেন হাজারো কবরের ভীড়ে। অবশ্য পরবর্তীতে সরকারের সহায়তায় নিজ জেলার মাটিতে সমাধিস্থ হতে পেরেছিলেন।

২০০০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ সরকার শহিদ রফিককে মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত করেন এবং সরকারিভাবে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে পারিল গ্রামে শহিদ রফিকের নামে পাঠাগার ও স্মৃতি যাদুঘর স্থাপন করা হয়। যা বর্তমানে আমাদের সকলের সামনে দৃশ্যত আছে। এইখানে তার ব্যবহৃত জিনিসপত্র ও প্রচুর বইপত্র বিদ্যমান আছে। এরও পূর্বে প্রশিকার উদ্যোগে তাঁর বাড়ি সংলগ্ন একটি ছোট লাইব্রেরি স্থাপন করা হয়। যেখানে মূলত তার স্মৃতিগুলো প্রথম থেকেই সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হয়।

শহিদ আবুল বরকত

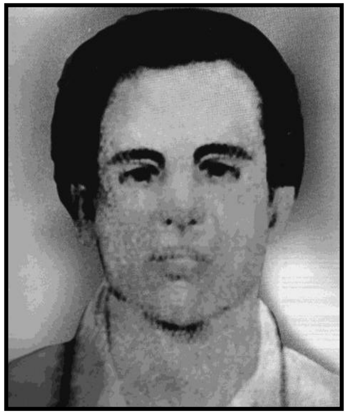

শহিদ আবুল বরকত ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ১৬ জুন ভারতের পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার ভরতপুর থানার বাবলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
পাশের গ্রাম তালিবপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা (এসএসসি) পাশ করেন। এরপর বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি এইচএসসি পাশ করেন।
১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে বরকত চলে আসেন পূর্ব বাংলায় অর্থাৎ বাংলাদেশে। ঢাকার পল্টনে বিষ্ণু প্রিয়া ভবনে তার মামা আব্দুল মালেকের বাড়িতে তিনি থাকতে শুরু করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে বরকত ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় শ্রেণিতে চতুর্থ স্থান লাভ করে তিনি অনার্স পাশ করেন। এরপর একই বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ ভর্তি হন।
১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সামনে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবিতে ছাত্রদের আন্দোলন জোরালো হতে শুরু করে। ছাত্রদের দমন করতে বেলা ৩টার দিকে হোস্টেল চত্বরে ঢুকে নির্মমভাবে গুলি চালাতে থাকে পুলিশ। সে সময় আবুল বরকত এক বন্ধুর দিকে এগিয়ে আসছিলেন। হঠাৎ তিনি মাটিতে পড়ে যান। প্রথমে কেউ বুঝে উঠতে পারেনি, ততক্ষণে রক্তধারা ছুটে মাটি ভিজে যায়। তলপেটে গুলি লেগেছিল তার। পরনে ছিল নীল হাফ শার্ট, খাকি প্যান্ট ও কাবুলী স্যান্ডেল। দু'তিন জন ছুটে এসে বরকতকে কাঁধে তুলে হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নিয়ে গেলেও শরীর থেকে বেশ অনেক রক্ত বের হওয়ার কারণে ডাক্তাররা আর তাকে বাঁচাতে পারেননি। অবশেষে রাত ৮টার দিকে বরকত ঢাকা মেডিকেল কলেজের জরুরী বিভাগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ২১ ফেব্রুয়ারি মোট কতজন শহিদ হন তার সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। কারণ অনেক শহিদের লাশ মর্গ হতে মিলিটারি ও পুলিশ লুকিয়ে ফেলে। বরকতের লাশটিও সেদিন মর্গ থেকে সরিয়ে ফেলেছিল পুলিশ। আবুল বরকতের মামা আব্দুল মালেক ছিলেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের এ্যাসিস্ট্যান্ট একাউন্টস অফিসার। আর তার এক আত্মীয় সরকারের উচ্চপর্যায়ে কর্মরত ছিলেন। তার নাম আবুল কাসেম। তারা দু'জনে তদবির করে পুলিশের কাছ থেকে বরকতের লাশ উদ্ধার করেন।২১ ফেব্রুয়ারি রাত ১০টার দিকে পুলিশের কড়া নজরদারির মধ্যে আজিমপুর পুরাতন গোরস্থানে লাশ দাফন করা হয়। শহিদ আবুল বরকতকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০০ খ্রিস্টাব্দে মরণোত্তর একুশে পদক দিয়ে সম্মানিত করেন।

শহিদ আব্দুল জব্বার

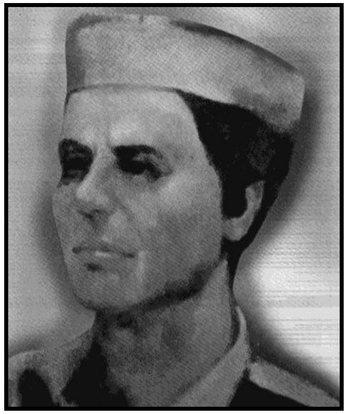

ভাষা শহিদ আব্দুল জব্বার ১০ অক্টোবর ১৯১৯ (বাংলা ২৬ আশ্বিন ১৩২৬ বঙ্গাব্দ) ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার পাঁচুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হাছেন আলী এবং মাতা সাফাতুন নেছা। তিনি ধোপাঘাট কৃষিবাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাজীবন শুরু করেন এবং পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে লেখাপড়া শেষ করেন। এরপর তিনি তার পিতাকে কিছুদিন কৃষি কাজে সাহায্য করেন। পরবর্তীকালে আরো ভাল কিছু করার আশায় তিনি নারায়ণগঞ্জে চলে আসেন এবং এখানে পরিচয় হয় একজন ইংরেজ নাবিকের সাথে। আব্দুল জব্বারকে রেঙ্গুন শহরে (সাবেক দেশ বার্মা বর্তমান মায়ানমারে) একটি চাকরীর ব্যবস্থা করে দেন।

১২ বৎসর আব্দুল জব্বার রেঙ্গুনে কাজ করেন এবং স্বাস্থ্যগত কারণে মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ইচ্ছে শিপে কাজ করতে না পারার দরুন পুনরায় গ্রামে ফিরে আসেন। তিনি গ্রামে ফিরে গ্রামের ছেলেদের নিয়ে একটি গ্রাম্য ডিফেন্স দল গঠন করেন যে দলের নেতৃত্বে তিনি কমান্ডার হিসেবে ছিলেন।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারির ২/৩ দিন আগে তিনি তাঁর ক্যান্সার আক্রান্ত শাশুড়ীকে চিকিৎসা করাতে সিরাজুল ইসলামের সহযোগিতায় শাশুড়ীকে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করান। তিনি তাঁর আত্মীয়া আয়শা খাতুন এবং পরিচিত আব্দুল হাইয়ের বাসায় ঐ সময় রাত যাপন করে দিনে শাশুড়ীকে সেবা করতে মেডিকেলে চলে আসতেন।

ঢাকা মেডিকেলের বাইরে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে যখন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার দাবিতে ছাত্র জনতা সোচ্চার এবং শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত ঢাকার রাজপথ তখন তিনি মেডিকেলে ভর্তি হওয়া রোগী তাঁর শাশুড়ীর শয্যা পাশে বসা থাকতেন। গুলিবিদ্ধ হওয়ার অল্পক্ষণ আগে সিরাজুল ইসলামের সাথে শাশুড়ীর রোগের ব্যাপারে কথা বলে তিনি মেডিকেলের গেইটের বাইরে শাশুড়ীর জন্য কিছু ফল কিনতে যান এবং ঐ সময় তিনি দেখেন রাষ্ট্র ভাষার দাবীতে বেশ কিছু ছাত্র-জনতা ব্যানারসহ সমবেত হয়েছে এবং বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষার দাবীতে অনবরত শ্লোগান দিয়ে যাচ্ছে। আব্দুল জব্বার আর স্থির থাকতে পারেননি। তিনি অসুস্থ শাশুড়ীর জন্য ফল নেওয়ার কথা ভুলে গিয়ে ব্যানার হাতে মিছিলের অগ্রভাগে এসে দাঁড়ান। ঐ সময়ে পুলিশের এলোপাতাড়ি গুলাগুলি শুরু হয়, এতে আব্দুল জব্বার গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়। অতিরিক্ত

রক্তক্ষরণে তিনি ২১ ফেব্রুয়ারি রাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। মহান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের শহিদদের মধ্যে অন্যতম একজন তিনি।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর এক বন্ধুর বোন আমেনা খাতুনকে বিয়ে করেন। ঐ সংসারে তাঁর একমাত্র ছেলে নুরুল ইসলাম বাদলের জন্ম হয়। তাঁর সন্তান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন।

শহিদ আব্দুল জব্বারকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০০ খ্রিস্টাব্দে মরণোত্তর একুশে পদক দিয়ে সম্মানিত করেন।

শহিদ আব্দুস সালাম

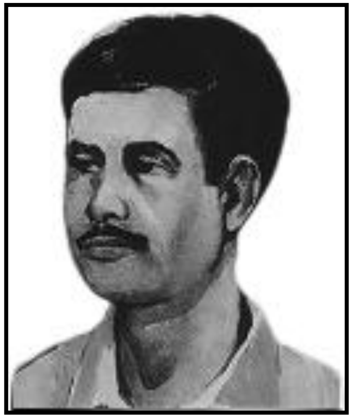

ভাষা শহিদ আব্দুস সালাম ফেনী জেলার দাগনভুঁইএঞা উপজেলার লক্ষণপুর গ্রামে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষণপুরের বর্তমান নাম সালাম নগর। পিতা মোহাম্মদ ফাজিল মিয়া এবং মাতা দৌলতের নেছা। তিনি স্থানীয় মাতুভূঁইএঞা করিমুল্লা জুনিয়র হাই স্কুলে নবম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর চাকরির সন্ধানে ঢাকায় আসেন। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ডিরেক্টরেট অব ইন্ডাস্ট্রিজ বিভাগে পিয়ন হিসেবে চাকরি পান। ঢাকায় ৩৬বি, নীলক্ষেত ব্যারাকে তিনি বসবাস করতেন। ৪ ভাই ও ৩ বোনের মধ্যে আব্দুস সালাম ছিলেন সবার বড়। বর্তমানে জীবিত আছেন শহিদ সালামের এক ছোটভাই আব্দুল করিম ও বোন বলকিয়ত নেছা।

মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনে টগবগে তরুণ সালামের হৃদয়েও আন্দোলনের ডাক ছুঁয়ে যায়। ২১ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) এবং ৮ই ফাল্গুন ১৩৫৯ বাংলা সাল, ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনের রাস্তায় সরকার কর্তৃক জারিকৃত ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করে ছাত্র-জনতা বাংলা ভাষার দাবিতে যে মিছিল করে আব্দুস সালাম সে বিক্ষোভ মিছিলে স্বপ্রণোদিতভাবে অংশগ্রহণ করেন। আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার সঙ্গে সালামও ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজপথে নেমে পড়লে মিছিলে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। বিকেল সাড়ে তিনটায় পুলিশের বেপরোয়া গোলাগুলিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ গুলিবিদ্ধ হন অনেকে। গুরুতর আহত অবস্থায় আব্দুস সালামকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সালামের মেসের কাজের বুয়ার ছেলে তেজগাঁ নাবিস্কোতে কর্মরত সালামের ভাতিজা মকবুল আহম্মদ ধনা মিয়াকে জানান তার চাচা সালাম গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। মকবুল ছুটে যান সালামের আরেক জেঠাতো ভাই হাবিব উল্লাহর কাছে। তারা দু'জনে মিলে দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এসে দেখেন পেটে গুলিবিদ্ধ হয়ে সালাম সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মেডিকেলের বারান্দায় পড়ে আছেন।

তারা ২১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় টেলিগ্রামে সালামের বাবা ফাজিল মিয়াকে ছেলের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাটি জানান। ফাজিল মিয়া তার অন্য এক ছেলেকে সাথে নিয়ে ঢাকা মেডিকেলে ছুটে আসেন। পর দিন সকাল ৯টার দিকে বেশ কিছু ছাত্র সালামের যথাযথ চিকিৎসা না করার অভিযোগে হাসপাতালে বেশ কিছুক্ষণ হট্টগোল করেন। মকবুল ও হাবিব উল্লাহ হাসপাতালে আসা যাওয়ার মধ্যে থাকলেও

সংজ্ঞাহীন সালামের বিছানার পাশ থেকে তার বাবা কোথাও আর যাননি। বাবার উপস্থিতিতে হাসপাতালেই ২৫ ফেব্রুয়ারি বেলা সাড়ে ১১টায় আব্দুস সালাম মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

২৬ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৪টার দিকে সালামের লাশ ঢাকাস্থ আজিমপুর গোরস্থানে নেওয়া হয়। সেখানে সালামের বাবা ফাজিল মিয়া, ভাতিজা মকবুল, জেঠাতো ভাই হাবিব উল্লাহসহ শত শত ছাত্র-জনতার উপস্থিতিতে সালামের জানাজা শেষে দাফন করা হয়।

২০০০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার ভাষা শহিদ আব্দুস সালামকে মরণোত্তর একুশে পদক প্রদান করেন। একুশে পদক প্রদানকালে গেজেটে তার মৃত্যুর তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারির স্থলে ৭ এপ্রিল উল্লেখ করা হয়। সেই থেকে সালামের মৃত্যুর তারিখ নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভাষা শহিদ আব্দুস সালামের কোনো ছবি কোথাও সংরক্ষিত ছিল না। তার কারণ ৬০ এর দশকে তৎকালীন স্থানীয় সাংসদ খাজা আহমদ শহিদ আব্দুস সালামের পিতা ফাজিল মিয়াকে দুই হাজার টাকা দিয়ে আব্দুস সালামের গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত শার্ট ও তাঁর দুটি আলোকচিত্র জাতীয় জাদুঘরে দেবেন বলে নিয়ে আসেন। কিন্তু তিনি ছবি এবং আব্দুস সালামের রক্তাক্ত শার্টটি কি করেছেন তার কোনো হদিস পাওয়া যায়নি।

শহিদ শফিউর রহমান

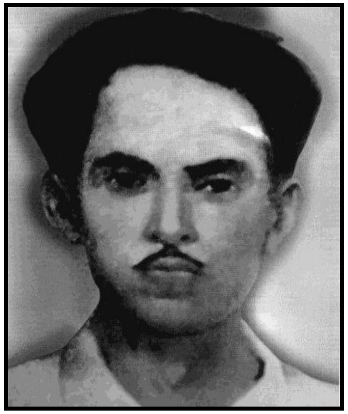

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে ২২ ফেব্রুয়ারি যাঁরা শহিদ হন শহিদ শফিউর রহমান তাঁদের মধ্যে অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা জেলার কোন্নাগরে তিনি ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাহবুবুর রহমান ছিলেন ঢাকার পোস্ট এন্ড টেলিগ্রাফ অফিসের সুপারিন্টেনডেন্ট।

শফিউর রহমান কলকাতা গভর্নমেন্ট কমার্শিয়াল কলেজ থেকে আই.কম পাস করেন। এরপর তিনি চব্বিশ পরগণার সিভিল সাপ্লাই অফিসে কেরানির পদে চাকরি নেন। কলকাতার তমিজ উদ্দিন আহমেদের কন্যা আকলিমা খাতুনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। দেশ বিভাগের পর চব্বিশ পরগণা ছেড়ে পিতার সঙ্গে ঢাকায় চলে আসেন। এখানে ঢাকার হাইকোর্টে হিসাব বিভাগের কেরানী পদে চাকরি নেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল দশটায় ঢাকার রঘুনাথ লেনের বাসা থেকে সাইকেলে চেপে অফিসের পথে রওনা হন। ঐদিন সকাল সাড়ে দশটার দিকে নবাবপুর রোডে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্র-জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পুলিশ এ বিক্ষোভ মিছিলে গুলি বর্ষণ করলে গুলি এসে শফিউরের পিঠে লাগে। আহত অবস্থায় তাঁকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। সেদিন সন্ধ্যায় তিনি মারা যান। রাত তিনটায় পুলিশ প্রহরায় তাঁকে আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করা হয়। আজ শফিউরের মতো আরও অনেক শহিদের আত্মত্যাগের জন্যই বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি শোক মিছিলের সময় কার্জন হলের সামনের রাস্তায় সামরিক বাহিনীর ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে মারা যায় আব্দুল আউয়াল। অহিউল্লাহ নামে দশ বছরের এক কিশোর নবাবপুর রোডে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। এ ছাড়া সামরিক বাহিনীর ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে মারা যায় অজ্ঞাত পরিচয়ের এক বালক। এরা সবাই ছিলেন অমর ভাষা শহীদ। বিশ্বের দরবারে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা এবং পরবর্তী সময়ে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশে তাঁরাই ছিলেন মূল স্থপতি এবং সকল সংগ্রামের অনুপ্রেরণা দাতা। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে তাকে একুশে পদক (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়।

অহিউল্লাহ

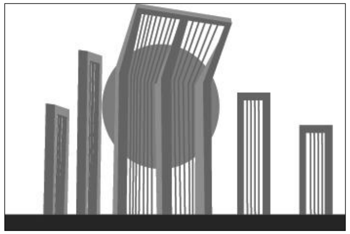

অহিউল্লাহ ছিলেন আমাদের ভাষা আন্দোলনের দামাল ছেলেদেও মধ্যে একজন শহিদ। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের একুশে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকার রাজপথে মিছিল বের হয় এবং আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে। সে মিছিলের এক কিশোর হলো অহিউল্লাহ।

সে ছিলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী তরুণ। তার কোনো অস্ত্র না থাকলেও ছিলো বুক ভরা সাহস। সে দেশ, ভাষা এবং সাধারণ মানুষকে অনেক ভালোবাসতেন তাই আন্দোলনে অংশ নিতে ভয় পাননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসার সামনে দিয়ে দক্ষিণে যে সড়কটি চলে গেছে তার নাম ফুলার রোড।

সেদিন ছাত্র জনতা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৪৪ ধারা ভেঙে মিটিং মিছিল করতে থাকে, ফুলার রোড মিছিলে মুখর হয়ে উঠেছিলে। স্বৈরাচারী শাসকবর্গ জনতার প্রাণের তুচ্ছজ্ঞান করে তাদের মিছিলে গুলি চালায়। মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সেই সাহসী কিশোরসহ আরো অনেকে। ফুলার রোডে পুলিশের গুলিতে শহিদ হয় অহিউল্লাহ।